আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মুখপত্র

মাসিক সুন্নীবার্তা

১৯০

SUNNI BARTA

১৯০তম সংখ্যা মার্চ'১৭ জমাদিউস সানী ১৪৩৮ হিজরী

www.sunnibarta.com

প্রচারে

আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত (বাংলাদেশ)

AHLE SUNNAT WAL JAMA'AT (BANGLADESH)

E-mail : sunnibarta@gmail.com. Website : www.sunnibarta.com

নং- জেপ্রঢা/প্রকা:/২০০৭/০৭

মাসিক
সুন্নীবার্তা
SUNNI BARTA

হাদিয়া টা: ১৫.০০

প্রতিষ্ঠাতা
অধ্যক্ষ হাফেয মুহাম্মদ আব্দুল জলিল (রাঃ)
এম.এম.এম.এ-বিসিএস

সম্পাদক
মুফতী মোহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দীন
খতীব, গাউছুল আ'যম রেলওয়ে জামে মসজিদ, উত্তর শাহজাহানপুর, ঢাকা।

সহকারী সম্পাদক
আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবুল হাশেম
প্রেসিডিয়াম সদস্য, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বাংলাদেশ।

ডঃ এ্যাডভোকেট আব্দুল আউয়াল
প্রেসিডিয়াম সদস্য, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বাংলাদেশ।

নির্বাহী পরিচালক
আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবদুর রব
প্রেসিডিয়াম সদস্য, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বাংলাদেশ।
যুগ্ম পরিচালক (অবঃ), বাংলাদেশ ব্যাংক
ফোন ঃ ৭২৭৫১০৭, ০১৭২-০৯০৬৯৯৬

যোগাযোগের ঠিকানা
আলহাজ্ব মোঃ আবদুর রব, মোবাইল: ০১৭২০৯০৬৯৯৬
আলহাজ্ব মোঃ শাহ আলম, মোবাইল : ০১৬৭০৮২৭৫৬৮
গাউছুল আ'যম রেলওয়ে জামে মসজিদ, উত্তর শাহজাহানপুর, ঢাকা-১২১৭

অফিস নির্বাহী
মুহাম্মদ সেকান্দর হোসেন সুমন
সভাপতি, বাংলাদেশ যুবসেনা, মোবাইল ঃ ০১৭১৬৫৭৩৩৩৩
সহযোগী ঃ মোঃ আবু তাহের, মোঃ ইয়াছিন আলী,
মোঃ আবু সাইদ, মোঃ রফিকুল ইসলাম

মহিলা অঙ্গন
সৈয়দা হাবিবুন্নেছা দুলন

উপদেষ্টা পরিষদ

- অধ্যাপক আলহাজ্ব এম. এ. হাই
- ইঞ্জিনিয়ার সৈয়দ কুদরত উল্লাহ
- আলহাজ্ব মোহাম্মদ শাহ আলম
- আলহাজ্ব এ্যাডঃ দেলোয়ার হোসেন পাটোয়ারী আশরাফী
- কাজী মাওঃ মোবারক হোসাইন ফরাজী আল-কাদেরী
- মুহাম্মদ সাইফুদ্দিন
- আলহাজ্ব মোঃ মজিবুর রহমান
- মোহাম্মদ হামিদুল হক শামীম (কাউন্সিলর)
- ফারুক আহমেদ আশরাফী
- এডভোকেট কামরুল হাসান খায়ের
- মুহাম্মদ ইউসুফ মিয়া
- মুহাম্মদ মজিবুর রহমান খান মুকুল
- নুরে সালাম

সহযোগিতায়

- এ্যাডভোকেট মোঃ জালাল উদ্দিন
- আলহাজ্ব আজিজুল হক চৌধুরী
- আলহাজ্ব মোঃ জাকির হোসেন
- এ.কে.এম. হাবিব উল কুদ্দুস
- আলহাজ্ব আবু আক্তার ফকির
- মোঃ শহীদুর রহমান
- সুলতান আহম্মেদ
- মোঃ মফিজুর রহমান
- ইঞ্জিনিয়ার শাহ্ আলম বাদল
- মোঃ খলিলুল্লাহ্ পাটোয়ারী
- আলহাজ্ব মোঃ শহিদুল্লাহ্
- কাজী নুরুল আফসার বিদ্যুৎ
- আলহাজ্ব রশিদ আহম্মদ কাজল
- মোঃ শরীফ
- হাজী আলী হোসাইন জাহাঙ্গীর
- সৈয়দ মোঃ নাঈম
- মুহাম্মদ আব্দুল আলীম
- মোঃ সিরাজুল ইসলাম

চারে ঃ গাউসুল আযম রেলওয়ে জামে মসজিদ, শাহ্জাহানপুর, ঢাকা
স্বত্বে ঃ সুন্নী ফাউন্ডেশন কমপ্লেক্স

বিজ্ঞাপনের হার ঃ রঙ্গীন পূর্ণ পৃষ্ঠা-৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা, অর্ধ পৃষ্ঠা-২৫০০ (দুই হাজার পাঁচশত টাকা), কোয়াটার পৃষ্ঠা-১০০০ টাকা

wvt w`jæev Bqvmwgb কর্তৃক প্রকাশিত এবং আল্ কারনী প্রিন্টার্স, ১০০/এ, আরামবাগ, ঢাকা-১০০০ হতে মুদ্রিত
ফোন ঃ ৯১১১৬০৭, E-mail : sunnibarta@gmail.com. Website: www.sunnibarta.com

সূচীপত্র

হাদিসের আলোকে শাফা'আতে মুস্তফা- - ০৩

অগণিত কারামতের ধারক গাউসুল আ'যম শায়খ আবদুল ক্বাদির জীলানী (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)--------- - ০৬

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)র নবী প্রেম---------- - ১৫

ডঃ শেখ শাহজাদা আহমদ পেয়ারা বাগদাদী (রাঃ)-এর মূল শিক্ষাই ছিল নবী প্রেম...---------- - ১৯

গাউসে পাকের জীবন ও কর্ম---------- - ২২

আওলাদে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মর্যাদা---------- - ২৫

অধ্যক্ষ হাফেজ এম. এ জলিল (রঃ) ছিলেন আমাদের হকপথের দিশারী---- - ২৮

আ'লা হযরত সম্পর্কে ওলামায়ে ইসলাম ও মনীষীদের অভিমত---------- - ৩০

- যে আমার রওযা যিয়ারত করবে তার জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব।
- যে ব্যক্তি আমার রওযা শরীফ যিয়ারত করবে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য শাফায়াতকারী ও সাক্ষী হবো।
- যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক আমার রওযা শরীফ জিয়ারত করবে, কিয়ামতের দিন সে আমার প্রতিবেশী হবে।
- যে ব্যক্তি অন্য কোন উদ্দেশ্য ছাড়া একমাত্র আমার রওযা শরীফ যিয়ারত করার উদ্দেশ্যে আসবে কিয়ামতে তার জন্য আমি সুপারিশকারী হব।

সম্পাদকীয়

১৮ ফাল্গুন ১৪২৩ । ০২ জমাদিউস সানী ১৪৩৮ । ০২ মার্চ ২০১৭

যারা ইসলাম ও মানবতার জন্য সারা জীবন নিবেদিত ছিলেন তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল সাহাবায়ে কেরাম। আর সাহাবাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)। ইসলাম প্রতিষ্ঠায় তাঁর ভূমিকা ছিল স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মত। যার উপর খুশি হয়ে দয়াল নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন- আমি সকলের ঋণ পরিশোধ করলেও, আবু বকর সিদ্দিক এর ঋণ পরিশোধ করতে পারি নাই। আমি তাঁর ঋণ পরিশোধ করব হাশরের ময়দানে। আর এই মহান ব্যক্তির ইন্তেকাল এই মাসে।

ইসলামের সোনালী যুগ অতিক্রান্ত হওয়ার পর বিভিন্ন ভ্রান্ত মতবাদ যখন মাথাচাঁড়া দিয়ে ওঠে, মুসলিম দেশসমূহে রাষ্ট্রীয় স্বেচ্ছাচারিতা ব্যাপকতা লাভ করে, ধর্ম ও নীতির দিক থেকে মুসলমানরা উদাসীন ও নির্লিপ্ত হয়ে পড়ে; এমন সংকটময় সময়ে এ ধরণীতে জিলান শহরের বুকে তশরীফ আনেন মাহবুবে সুবহানী কুত্বে রাব্বানী শেখ সৈয়্যদ মুহিউদ্দীন আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ)। বাগদাদ শহর একদিকে সুখ-সম্পদ ও কৃষ্টি সভ্যতার চরম শিখরে উঠেছিল, অন্যদিকে অনাচার, উচ্ছৃংখলতা ও ভোগ বিলাসিতার লীলাভূমিতে পরিণত হয়েছিল, খলিফা থেকে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত কারো কাছে ধর্মীয় রীতি-নীতি মানার খুব একটা বালাই ছিল না, এমন চরম সন্ধিক্ষণে বিশ্বকে হযরত আব্দুল কাদের জিলানী'র (রহঃ) আগমনে ইসলামের আকাশে দেখা দেয় সত্যের দীপ্যমান সূর্যালোক;আত্মবিস্মৃত জাতির মধ্যে সঞ্চার হলো নব চেতনার।

হযরত গাউসে পাক (রহঃ) এর প্রবর্তিত ক্বাদেরিয়া ত্বরীকার যে শিক্ষা তা চর্চার মাধ্যমে যেন হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সন্তুষ্টি অর্জনে সক্ষম হতে পারি পবিত্র ফাতেহা-এ ইয়াজদাহুম উপলক্ষে এই কামনাই করি। আমিন।

হাদিসের আলোকে শাফা'আতে মুস্তফা

মুহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দীন

عن جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة "

অনুবাদ

হযরত জাবের রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আমাকে পাঁচটি বস্তু (নে'মাত) দেয়া হয়েছে, যেগুলো আমার পূর্বে কাউকে দেয়া হয়নি। ১. আমাকে এক মাসের দূরত্ব পর্যন্ত প্রভাব বিস্তারকারী ভক্তি প্রযুক্ত ভয় বিশিষ্ট চেহারা দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে। ২. আমার কারণে সমগ্র পৃথিবীকে মসজিদ তথা নামাযের উপযুক্ত এবং পবিত্র করে দেয়া হয়েছে; সুতরাং আমার উম্মতের যে কারো কাছে নামাযের সময় হলে যে কোন জায়গায় নামায পড়ে নিতে পারবে। ৩. আমার জন্য গণীমতের মাল হালাল করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে অন্য কারো জন্য হালাল করা হয়নি। ৪. আমাকে শাফা'আতের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে এবং ৫. অন্যান্য নবীগণ প্রেরিত হয়েছেন নির্দিষ্ট গোত্রের জন্য আর আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে সমগ্র মানব জাতের জন্য। (সূত্র :- বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

হাদীস শরীফের ব্যাখ্যা

সাধারণ মানুষদেরকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য এবং বাতিল অপশক্তিকে দুর্বল করার জন্য বিশেষ করে শত্রুদের কাবু করার নিমিত্তে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নূরানী চেহারা মুবারকে এমন একটি ব্যতিক্রমধর্মী আকর্ষণ ভক্তিপ্রযুক্ত ভয় ঢেলে দিয়েছেন, যা এক মাসের দূরত্ব পর্যন্ত বিস্তার করত। ইতিহাস তার সাক্ষ্য বহন করে। মক্কার দুর্দান্ত প্রতাপশালী ব্যক্তিবর্গ, যেমন- আবূ জাহল, আবূ লাহাব, ওতবা, শাইবা, ওয়ালিদ ইবনে মুগীরা প্রমুখ গোপনে অনেক ষড়যন্ত্রের জাল বুনলেও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র সামনে দাঁড়িয়ে তা বাস্তবায়ন করার সাহস পায়নি কখনো। তাছাড়া তাঁকে আল্লাহ তা'আলা এমন সব বৈশিষ্ট্য দিয়েছেন, যেগুলো অন্য কোন নবী ও রাসূলকে দেননি। আলোচ্য হাদীস শরীফে এমন কতিপয় বৈশিষ্টের কথা এরশাদ করা হয়েছে। ওইগুলোর সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নে প্রদত্ত হলো -

এক.

হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত অপর এক হাদীস শরীফে দেখা যায়- নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

نصرت بالرعب على العدو

"আমি সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছি শত্রুদের
উপর ভক্তিপ্রযুক্ত ভয় দিয়ে।"

উল্লেখিত হাদীসে 'এক মাস দূরত্ব পর্যন্ত রসূলে পাকের ভক্তিপ্রযুক্ত ভয়-ভীতি সমৃদ্ধ চেহারার কথা বলে এটা বুঝানো হয়েছে যে, কোন দুশমন নবী পাকের চেহারা মুবারক দেখার পর এমনভাবে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ত যে, তার সমস্ত শরীরে কম্পন সৃষ্টি হত, আর তা চলার পথে তার মধ্যে এক মাস পর্যন্ত বহাল থাকত।

এ জাতীয় আরো বহু হাদীস শরীফ বিশুদ্ধ বর্ণনাসূত্রে বিভিন্ন হাদীসগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। একমাস দূরত্ব'- এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আল্লামা ইবনে হাজার আসক্বালানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন- 'মুসলামানদের প্রধান দুশমন কাফির-ইহুদী ও নাসারাদের প্রাণকেন্দ্র তথা শাম-ইরাক, ইয়ামেন এবং মিসর ইত্যাদি এলাকায় পৌঁছতে একমাস যাবৎ চলতে হতো। [ফাতহুল বারী, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১২৮ পৃষ্ঠা]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত অপর হাদীসে 'একমাস'র স্থলে 'দুইমাস' দূরত্বের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। [তাবরানী, আল-মুজামুল কবীর]

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র শরীর ও চেহারা মুবারকে এতই সৌন্দর্য ও সম্মোহনী প্রভাব ছিল যে, হঠাৎ কেউ দেখলেই চমকে ওঠতো আর একাগ্রচিত্তে কেবল চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকত। এ বিষয়ে তৎকালীন প্রসিদ্ধ চিকিৎসা বিজ্ঞানী ইবনে আবূ রমসা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আমি যেদিন মদীনা

মুনাওয়ারায় আসলাম, সেদিন প্রথমে রসূলে পাকের দর্শন লাভ হয়নি। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর হঠাৎ দেখলাম এক অসাধারণ নূরাণী অবয়বের ব্যক্তি আমাদের সামনে তশরীফ আনলেন, তাঁর পরনে ছিল দু'টি সবুজ রঙের পোষাক আমি আমার ছেলেকে বললাম, "খোদার শপথ করে বলছি! ইনিই হলেন আল্লাহর রসূল! অতঃপর আমার ছেলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র নূরানী দেহ ও চিত্তাকর্ষক চেহারা দর্শনে এতবেশি প্রভাবিত হল যে, দেখলাম তার সমস্ত শরীরে কম্পন শুরু হয়ে গেছে। [মুসনাদে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল :২য় খন্ড, ২২৮পৃষ্ঠা]

দুই.

নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- আমার কারণে সমগ্র পৃথিবীকে মসজিদ বানিয়ে দেয়া হয়েছে এবং পবিত্র করে দেয়া হয়েছে। পূর্ববর্তী নবীর উম্মতগণ তাদের ইবাদত-বন্দেগী ও নামায আদায় কারার জন্য নির্ধারিত ইবাদতখানা ছিল। নির্দিষ্ট স্থান ছাড়া অন্য কোথাও ইবাদতের অনুমতি ছিল না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে উম্মতে মুহাম্মদীর বৈশিষ্ট্য ব্যতিক্রম। নবীজির শুভগমনের সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন মাঠ- ময়দান, ঘর-বাড়ি-আঙ্গিনা, রাস্তা-ঘাট সব জায়গাকে পবিত্র ও ইবাদতের জন্য উপযুক্ত করে দিয়েছেন। তাই আমরা নামাযের সময় হলে সুবিধামত যে কোন পবিত্র জায়গায় নামায আদায় করে নিতে পারি। আমাদের জন্য এটা বৈধ।

বিষয়টিকে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো স্পষ্ট করেছেন এভাবে- আমার উম্মতের সামনে নামাযের ওয়াক্ত হাযির হলে সে যেখানেই থাকুকনা কেন, নামায পড়ে নিলে তা আদায় হয়ে যাবে।

হাদীসে পাকের আলোচ্য বর্ণনা দ্বারা বুঝা গেল যে, সমগ্র যমীনের উপর নামাযের অনুমতি দেয়া হয়েছে। ইসলামী ফিক্বহের দৃষ্টিতে এরপরও কিছু জায়গায় নামায পড়া শরীয়তের দৃষ্টিতে নিষেধ পরিলক্ষিত হয়। যেমন- কবরস্থান, গোসলখানা, উট-গরু বাঁধার জায়গা এবং ওই সব জায়গা যেখানে নাপাকী লেগে আছে ইত্যাদি। উল্লেখ্য এগুলোও নির্দিষ্ট কারণ সাপেক্ষে। বস্তুতঃ উল্লেখিত জায়গাগুলোও উল্লিখিত অবস্থা বিরাজ করার পূর্বে নামাযের উপযোগী ছিল।

তিন.

তৃতীয় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হল যুদ্ধলব্ধ সম্পদ তথা গণীমতের মাল আমাদের প্রিয়নবীর জন্য হালাল ঘোষণা করা হয়েছে; যা অন্য কোন নবীর জন্য হালাল ছিল না। পূর্ববর্তী উম্মতের জন্য গণীমতের মাল বৈধ ছিল না। তাই তাদের গণীমতের সম্পদসমূহ আগুন গ্রাস করে ফেলত। এর রহস্য ছিল তাদের জিহাদ যেন গণীমত লাভের উদ্দেশ্যে না হয়, বরং নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনার্থে হয়। এদিকে উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য গণীমত হালাল করা হয়েছে; কেননা এ উম্মতের অন্তরে নিষ্ঠার প্রাধান্য ছিল; গণীমত লাভ প্রধান উদ্দেশ্য নয়।

ঐতিহাসিক বদরের যুদ্ধের ঘটনা পর্যালোচনা করলে বাস্তব চিত্র ভেসে ওঠে। যাতে মুসলমানদের কোন অত্যাধুনিক এমনকি প্রয়োজনীয় অস্ত্র-সস্ত্রও ছিল না। পক্ষান্তরে দুশমনদের ভারী-ভারী অস্ত্র ও হাতিয়ারের সামনে একমাত্র মহান আল্লাহ্র গায়েবী সাহায্যের কারণে মুসলমানগণ গৌরবগাঁথা বিজয় অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন। মুসলমানদের বীরত্বপূর্ণ আক্রমনে কাফির বাহিনী পর্যদুস্ত হয়ে তাদের অস্ত্র-সস্ত্র, মাল-সামগ্রী ফেলে পালিয়ে যাওয়ার পরও কোন মুসলমান ওইসব গণীমতের মালের দিকে হাতও বাড়াননি। বরং সকল গণীমতের মাল একত্রিত করা হলে মহান রব্বুল আলামীন পবিত্র ক্বোরআনের বাণী অবতীর্ণ করলেন -

لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (৬৮) فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا

অর্থাৎ- যদি আল্লাহ পূর্বেই একটা (বিধান) লিপিবদ্ধ না করতেন, তবে হে মুসলমানগণ! তোমরা যা কাফিরগণের নিকট থেকে মুক্তিপণের মাল গ্রহণ করেছ, তজ্জন্য তোমাদের উপর মহাশাস্তি আসত। সুতরাং তোমরা আহার কর যে-ই গণীমত তোমরা লাভ করেছ, বৈধ-পবিত্র হিসেবে।[সূরা আনফাল-৬৮-৬৯]

আরো এরশাদ হয়েছে-

وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (২০)

অর্থাৎ - আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ওয়াদা দিয়েছেন, যা তোমরা লাভ করবে। তিনি তা তোমাদের জন্য তরান্বিত করবেন আর তিনি তোমাদের থেকে শত্রুদেরকে স্তব্ধ করে দিয়েছেন

যাতে এটা মু'মিনদের জন্য এক নিদর্শন হয় এবং তোমাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন। [সূরা ফাতাহ, আয়াত - ২০]

চার.

اعطيت الشفاعة অর্থাৎ আমাকে শাফা'আতের ক্ষমতা দান করা হয়েছে ক্বিয়ামতের কঠিন দিনে সবাই 'এয়া নাফসী' এয়া নাফসী' তথা নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকবে। অসনহীয় গরমে অতিষ্ঠ হয়ে একটু ছায়া পাওয়ার আশায় এদিক- সেদিক ছুটাছুটি করবে। ঠিক সেই কঠিন মুসীবতের সময় আমাদের প্রিয়নবীই একমাত্র প্রথমে সমস্ত উম্মতের জন্য শাফায়াত করবেন। শাফা'আত-ই কুবরা তথা বৃহত্তম সুপারিশ'র ক্ষমতা একমাত্র আমাদের নবী ছাড়া আর কাউকে দেয়া হয়নি। আমাদের নবী সুপারিশের দরজা উন্মুক্ত করার পর অন্যান্য সুপারিশকারীরা তাঁদের সুপারিশ উত্থাপন করবেন। হযরত আবূ হুরায়রা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন,

لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة

অর্থাৎ, প্রত্যেক নবীর জন্য একেকটি মাক্ববুল দো'য়া রয়েছে, যা দ্বারা তিনি আল্লাহ্‌র দরবারে দো'য়া করে থাকেন। আমি আমার দু'আটা পরকালের জন্য সংরক্ষণ করে রাখতে চাই, যা দ্বারা পরকালে আমার উম্মতের জন্য শাফা'আত করব। [বুখারী শরীফ, হাদীস নং ৫৯৪৫]

হযরত আনাস ইবনে মালিক রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন -

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَشْفَعَ لِي يَوْمَ القِيَامَةِ، فَقَالَ: أَنَا فَاعِلٌ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ فَأَيْنَ أَطْلُبُكَ؟ قَالَ: اطْلُبْنِي أَوَّلَ مَا تَطْلُبُنِي عَلَى الصِّرَاطِ. قَالَ: قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَلْقَكَ عَلَى الصِّرَاطِ؟ قَالَ: فَاطْلُبْنِي عِنْدَ المِيزَانِ. قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَلْقَكَ عِنْدَ المِيزَانِ؟ قَالَ: فَاطْلُبْنِي عِنْدَ الحَوْضِ فَإِنِّي لاَ أُخْطِئُ هَذِهِ الثَّلاَثَ المَوَاطِنَ.

অর্থাৎ: আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র দরবারে ক্বিয়ামত দিবসে আমার জন্য শাফা'আত করার আবেদন করলাম। উত্তরে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, হ্যাঁ আমিই শাফা'আত করব। অতঃপর আমি আবেদন করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! সে দিন আমি আপনাকে কোথায় তালাশ করব? নবী -ই পাক এরশাদ করলেন, তুমি তালাশ করবে পুলসিরাতের পাশে" আমি বললাম,"যদি সেখানে আপনার সাক্ষাৎ না পাই তাহলে? উত্তরে আল্লাহর রসূল এরশাদ করলেন, "তাহলে তুমি তালাশ করবে আমাকে মীযানের পাশে। "আমি আবেদন করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! যদি সেখানেও না পাই? "উত্তরে আল্লাহ্‌র হাবীব এরশাদ করলেন, "তাহলে তুমি আমাকে 'হাউয-ই কাউসারে তালাশ করবে। কেননা, আমি সেদিন এই তিন স্থানেই থাকব। [তিরমিযী, মুসনাদে ইমাম আহমদ, আত্তারিখুল কবির, ফাতহুল বারী]

পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছে–

عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا-

অর্থাৎ "নিশ্চয় আপনার প্রভু আপনাকে 'মক্বাম-ই মাহমূদ'র আসনে সমাসীন করবেন।" তিরমিযী শরীফে রয়েছে হযরত আবূ হুরায়রা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্ত আয়াতে 'মক্বাম-ই মাহমূদ'র ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি এরশাদ করেন - هي الشفاعة (সেটা হল শাফা'আত)।

পরিশেষে, এ হাদীস শরীফ হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে আমাদের আক্বা ও মাওলা'র বিশেষ মর্যাদার প্রমাণ পাওয়া যায়। ওই বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে হুযূরের শাফা'আতের অনন্য ক্ষমতা। এছাড়াও প্রসিদ্ধ সনদে আরো বহু হাদীস শরীফ রসূল-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র শাফা'আতের প্রমাণ বহন করে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বর্তমানে কিছু সংখ্যক মুসলমান নামধারী জ্ঞানপাপী নবী পাকের শাফা'আতকে অস্বীকার করে বসেছে। তাদের জন্য এ হাদীস শরীফ ও এর ব্যাখ্যা সত্যিই পথ প্রদর্শন করবে। বস্তুতঃ যারা নবী পাকের শাফা'আতকে অস্বীকার করে, তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অনুসারী নয়। এরা ভ্রান্ত ও জাহান্নামী; এরা নবীদ্রোহী। আল্লাহ পাক আমাদেরকে এদের ভ্রান্ত আকীদামুক্ত সত্যিকার শান-মান ইত্যাদি উপলব্ধি করার তাওফীক্ব দান করুন ও পরকালে প্রিয়নবীর শাফা'আত নসীব করুন, আমীন!

অগণিত কারামতের ধারক
গাউসুল আ'যম শায়খ আবদুল ক্বাদির জীলানী (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান

ইসলাম ও মুসলমানদের ইতিহাসে হযরত বড়পীর গাউসুল আ'যম মুহিউদ্দীন শায়খ আবদুল ক্বাদির জীলানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর শুভ আবির্ভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বরকতমন্ডিত। হিজরী পঞ্চম শতাব্দির শেষার্ধে একদিকে ইসলামের শত্রুদের নানাবিধ চক্রান্ত, অন্যদিকে বিভিন্ন ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট জনগোষ্ঠী এবং উদাসীন শাসকবর্গের অস্বাভাবিক আদর্শচ্যুতির কারণে মুসলমানদের অবস্থা একেবারে শোচনীয় হয়ে পড়েছিলো, সর্বোপরি যখন মুসলিম সমাজে দ্বীন-ইসলাম মৃতপ্রায় হয়ে পড়লে একজন অসাধারণ বেলায়তী শক্তি সম্পন্ন সংস্কারক ও পুনরুজ্জীবিতকারীর জন্য আর্তনাদ ধ্বনিত হচ্ছিলো, ঠিক তখনই শায়খ 'মুহিউদ্দীন গাউসুল আ'যম শাহানশাহে বাগদাদের শুভ জন্ম হয়েছিলো। তিনি তাঁর খোদাপ্রদত্ত 'গাউসিয়াত-ই কুবরা'র অসাধারণ প্রজ্ঞা ও ক্ষমতাবলে দ্বীন-ইসলামকে সার্বিকভাবে পুনর্জীবিত করেন। তাঁর পবিত্র জন্ম, শিক্ষার্জন, রিয়াযত ও সংস্কার পদ্ধতি ও এর সুদূরপ্রসারী সুফল ইত্যাদি - সবই কারামত বা অলৌকিকই ছিলো। তাঁর এ কারামতের সংখ্যাও অগণিত। বিশ্ব বরেণ্য অনেক বিজ্ঞ ইমাম ও ওলামা-ই কেরাম তাঁর কারামতগুলো অতি নির্ভরযোগ্য পন্থায় লিপিবদ্ধ করেছেন। যার ফলে হুযূর শাহানশাহে বাগদাদের কারামত ও গাউসিয়াতের বিষয়টি মানব সমাজের সর্বস্তরে সবিশেষ প্রসিদ্ধ। আমি এ নিবন্ধে হুযুর গাউসে পাকের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তার ওই অসংখ্য কারামতের কিছুটা উল্লেখ করে বরকত হাসিল করার প্রয়াস পেলাম।

জন্ম শরীফ

ওলীকুল শিরোমণি গাউসুল আ'যম শায়খ আবদুল ক্বাদির জীলানী কুদ্দিসা সিররুহু ৪৭০হি., ১ রমযানুল মুবারক জুমাবার সুবহে সাদিক্বের কিছু পূর্বে জন্ম গ্রহণ করেন। এটাই প্রসিদ্ধতম অভিমত। জন্মস্থান- অনারবীয় ভূখন্ড তাবারিস্তানের পাশে 'গীল' বা 'গীলান', আরবীতে 'জীল' বা 'জীলান'। আঠার বছর বয়সে তিনি বাগদাদে তাশরীফ নিয়ে যান। সেখানেই ৯০/৯১ বছর বয়সে তাঁর ওফাত হয় এবং সেখানেই তাঁর মাযার শরীফ অবস্থিত। [সূত্র- 'আল বিদায়াহ্ ওয়ান নিহায়াহ্' কৃত- ইমাম হাফেয ইবনে কাসীর দামেস্কী এবং নাফহাতুল উন্‌স' কৃত- আল্লামা আব্দুর রহমান জামী]

অবশ্য, শায়খ আবুল ফাদ্বল সালিহ্ জীলী বলেছেন, হুযূর গাউসে পাকের জন্মসাল ৪৭১ হি.। তারিখ ও সময়ে উভয়ে একমত।

এ মতভেদের কারণ হচ্ছে হযরত গাউসুল আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে এ সম্পর্কে কেউ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছিলেন, "যে বছর আমি বাগদাদ এসেছি, তখন ছিলো ৪৮৮ হিজরী আর আমার বয়স ছিলো আঠার বছর।" হুযূর গাউসে পাকের এ উক্তি থেকে কেউ বুঝে নিয়েছেন যে, তখন তাঁর আঠার বছর পূর্ণ হয়েছে। আর কেউ কেউ মনে করেছেন যে, তখন তিনি অষ্টাদশ বছরেই ছিলেন। এরপর কেউ কেউ ইমাম ইয়াফি'ঈর কথামত হযরত গাউসুল আ'যমের জন্মসাল ৪৭০ হিজরী লিখেছেন, আর কেউ কেউ শায়খ আবুল ফাদ্বলের কথামতো ৪৭১ হিজরী লিখেছেন। আবজাদের হিসাবানুযায়ী, আরবী (ইশ্‌ক্ব) শব্দে তাঁর জন্মসাল প্রকাশ পায়, অর্থাৎ ৪৭০, অথবা (আশিক্ব) থেকে, অর্থাৎ ৪৭১ হিজরী।

উল্লেখ্য, এ পবিত্র জন্ম থেকেই তাঁর কারামত প্রকাশ পেতে থাকে। তিনি ১ রমযান জন্মগ্রহণ করতেই সেদিন থেকে রোযা পালন করেন। সারাদিন তিনি মায়ের দুধ পান করেন নি। এমনকি অন্যান্য মুসলমানকেও রোযা পালনের সুযোগ করে দেন। কারণ, পূর্ববর্তী দিন ছিলো ২৯ শা'বান। আকাশ ছিলো মেঘাচ্ছন্ন। তাই আকাশে ওই দিন সন্ধ্যায় রমযানের চাঁদ দেখা যায়নি। তাই এ দিনটি কি ৩০ শা'বান, না ১লা রমযান এতে সন্দেহ ছিলো। উল্লেখ্য, তাঁর আম্মাজানের বর্ণনানুসারে, পুরো শৈশবে তিনি এভাবে রোযা পালন করেছেন। শত চেষ্টা করেও তাঁকে সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দুধ পান করানো যেতো না। সুবহানাল্লাহ।

এটাতো হযরত গাউসুল আ'যমের জন্মকালের কারামত। মাতৃগর্ভে থাকাবস্থায় তাঁর কারামত আরো আশ্চর্যজনক। তা হচ্ছে- মাতৃগর্ভেই তিনি পবিত্র ক্বোরআনের আঠার পারা মুখস্থ করে ফেলেছিলেন। তাঁর আম্মাজান আঠার পারার হাফেযা ছিলেন। তিনি প্রতিদিন এ আঠারা পারা অবশ্যই তিলাওয়াত করতেন। তার নিকট শুনে মাতৃগর্ভে থাকাবস্থায় তিনি এ আঠার পারা মুখস্থ করে ফিলেছিলেন। তাঁর প্রমাণ পাওয়া যায় এভাবে যে, ইসলামী নিয়মানুসারে শৈশবে তাঁকে মক্তবে সর্বপ্রথম সবক দেওয়ার সময় ওস্তাদ মহোদয় বললেন, পড়ো 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম'। অমনি শিশু গাউসুল আ'যম জীলানী 'বিসমিল্লাহ্ শরীফ' পাঠ করার পর সূরা ফাতিহা পাঠ করে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি একটানা ১৮ পারা তিলাওয়াত শেষ করতে থাকলেন। আর সবাই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে শুনতে রইলেন। এটা কিভাবে সম্ভব হলো জানতে চাওয়া হলে এ মাদারজাত ওলী বলেছিলেন- মায়ের গর্ভে থাকাকালে মায়ের তিলাওয়াত শুনেই তিনি এ আঠার পারা মুখস্থ করে ফেলেছেন।

তাছাড়া, গর্ভে থাকাবস্থায় মায়ের আব্রু রক্ষার ঘটনা (কারামত) ও সবিশেষ প্রসিদ্ধ। হযরত বড়পীর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বয়স যখন দশ বছর, তখন একদিন তিনি এক কথার জবাবে আপন আম্মাজানকে বললেন, "আপনার গর্ভে থাকাস্থায় আমিও আপনার উপকার করেছিলাম।" আম্মাজান অবাক হয়ে গেলেন আর বললেন,"তা কিভাবে?" তিনি বললেন, "একদিন আপনি ঘরে একা ছিলেন। তখন এক ভিক্ষুক এসে কিছু খাদ্য চেয়েছিলো। ঘরের বাইরে থেকে সে অসহনীয় ক্ষুধার কথা উল্লেখ করে বারংবার খাবার চাচ্ছিলো। কিন্তু কোন সাড়া না পেয়ে এ বলে চলে যাবার মনস্থ করলো 'হায়! আজ হয়তো ক্ষুধার জ্বালায় মরেই যাবো।"

এটা শুনে, হে আম্মাজান, আপনার মনে দয়া ঢেউ খেললো। আপনি পর্দার আড়ালে নিম্নস্বরে ভিক্ষুকের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, 'তোমার জন্য বারান্দায় খাবার দিয়েছি। সেখানে গিয়ে খেয়ে নাও। পর্দার আড়ালে থেকে তিনি এ খাবার দিয়েছিলেন। ভিক্ষুকও খাবারটুকু আহার করলো। কিন্তু এরপর তার মনে শয়তানী খেয়াল চেপে বসলো। সে কুপ্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে আন্দর মহলের দিকে পা বাড়াতে লাগলো। অমনি একটি গায়েবী বাঘ এসে উক্ত ভিক্ষুককে মেরে ফেলেছিলো। আর আল্লাহ্ তা'আলা আপনার আব্রু রক্ষা করেছিলেন। বলুন তো ওই বাঘ কে ছিলো? আম্মাজান বলেন; কিন্তু বাঘটির রহস্য কি ছিলো, তুমি বলো! তিনি বললেন, "আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে ওইদিন আমার রূহ আপনার গর্ভ থেকে বের হয়ে বাঘের সূরত ধরে ওই শয়তান ভিক্ষুককে হত্যা করেছিলো। এটা শুনে ওই রত্নগর্ভা আম্মাজান আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করলেন। [সূত্র- 'মু'জিয়া-ই আম্বিয়া ও কারামতে আউলিয়া]

বাক্যকাল ও ছাত্র জীবনঃ

তিনি নিজেই বাল্যজীবনের বর্ণনা এভাবে দিয়েছেন- আমি আমার সমবয়সী ছেলেদের সাথে কখনো খেলাধূলার দিকে অগ্রসর হতে চাইতাম; কিন্তু আমি অদৃশ্য থেকে আওয়াজ শুনতাম "আবদুল ক্বাদির! খেলাধূলা থেকে বিরত থাকো।" আমি ভয় পেয়ে যেতাম আর দৌড়ে গিয়ে আমার মায়ের আঁচলের নীচে আশ্রয় নিতাম। কখনো ঘুমানোর ইচ্ছা করলেও একই ধরনের আহবান শুনতাম, "তোমাকে এজন্য সৃষ্টি করা হয়নি, ওঠো!" বাল্যকালে আমি শিশুসূলভ আচরণে এক গাভীর লেজ ধরে টান দিতেই সেটা বললো, "আবদুল ক্বাদির, এতদুদ্দেশ্যে তুমি সৃষ্ট হওনি।" সাথে সাথে আমি সেটা ছেড়ে দিলাম এবং অজানা ভয় আমাকে পেয়ে বসলো। হযরত বড়পীর গাউসুল আ'যমকে যখন মক্তবে পাঠানো হতো, তখন একদল ফিরিশ্‌তা তাকে মক্তবে পৌঁছিয়ে দিতেন। মক্তবে ছাত্রদের ভিড়ের কারণে বসার জায়গা থাকতো না। হঠাৎ সকলে গায়বী আওয়াজ শুনতে পেতো- تفسحوا لولى الله (তোমরা আল্লাহর ওলীর জন্য জায়গা করে দাও)!

উক্ত মক্তবের আরেক দিনের ঘটনা। এক দরবেশ মক্তবে আসলেন। হুযূর গাউসে পাক আগমন করলে এক গায়বী আওয়াজ শুনতে পেলেন, "তোমরা আল্লাহ্‌র ওলীর জন্য জায়গা করে দাও।"

তখন ওই দরবেশ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন -

سيكون له شأن عظيم – يعظم فلا يمنع ويتمكن فلا يحجب – ويقرب فلايمسك -

অর্থাৎ: এ বালক অবিলম্বে অতিমাত্রায় উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হবেন। তিনি বিনা বাধায় সম্মানিত হবেন। তিনি বিনা অন্তরালে মিলন লাভে সক্ষম হবেন। তিনি নৈকট্য লাভ করে ধন্য হবেন, তাঁকে রুখা যাবে না।

হুযূর গাউসে পাক বলেছেন, দীর্ঘ চল্লিশ বছর পর আমি এ দরবেশের সাক্ষাৎ পেয়েছি। তখন বুঝতে পেরেছিলাম- তিনি অন্যতম আবদাল ছিলেন।

কৈশোর ও উচ্চশিক্ষার জন্য বাগদাদ যাত্রা

বাল্যকালেই হযরত গাউসুল আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর পিতা ইন্তিকাল করেন। তিনি ছেলের উচ্চ শিক্ষার জন্য ৪০টি দিনার তাঁর স্ত্রী অর্থাৎ হুযূর গাউসে পাকের আম্মাজানের নিকট রেখে যান। এ কারণে হুযূর শাহানশাহে বাগদাদকে পিতার সংসারের হালও ধরতে হলো। সুতরাং তিনি একদিন গাভী নিয়ে মাঠে যাচ্ছিলেন। গাভীটি পেছনের দিকে ফিরে মানুষের মতো বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় বললো-

يا عبد القادر ما لهذا خلقت الا بهذا امرت -

অর্থাৎ, এ কাজের জন্য না আপনাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, না আপনাকে এ কাজ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

গাভীর মুখে এ সতর্কবাণী শুনে তিনি বুঝতে পারলেন এক মহান কাজের জন্য তাঁকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর ওই মহান দায়িত্ব পালনের জন্য তাঁকে দ্বীনী উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে হবে। সুতরাং তিনি উচ্চ শিক্ষার্জনের জন্য বাগদাদ চলে যেতে মনস্থ করলেন এবং আপন মায়ের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করলেন। বার্দ্ধক্যেও একমাত্র পার্থিব অবলম্বন আপন পুত্রকে অশ্রুসজল নয়নে বিদায় দিতে সম্মত হন তিনি। তখন বাগদাদ নগরী যেমন ব্যবসার প্রাণকেন্দ্র, তেমনি বিদ্যা শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চারও কেন্দ্রস্থল ছিলো। সুতরাং হুযূর গাউসে পাক এক ব্যবসায়ী কাফেলার সাথে বাগদাদেও উদ্দেশে রওনা হন। তখন তাঁর বয়স আঠার বছর আর মায়ের বয়স আটাত্তর বছর। দ্বীন ও মাযহাবের খাতিরে এ মহীয়সী, জ্ঞান ও গুণবতী মহিলা আপন সন্তানের পড়ার খরচ বাবদ স্বামীর প্রদত্ত ওই গচ্ছিত ৪০ টি দীনার সন্তানের জামার বগলের নীচে পকেট সেলাই করে ওই পকেটে দিয়ে বললেন- "তোমাকে আল্লাহ্‌র দরবারে সোপর্দ করলাম।" আর নসীহত করলেন, "কখনো যে কোন অবস্থায় মিথ্যা বলবে না। কারণ সত্যবাদিতা মানুষকে বিপদমুক্ত করে ও উন্নতির দিকে নিয়ে যায়।"

ডাকাতদলের কবলে এবং কারামত প্রকাশ

বাগদাদ যাত্রার ঘটনা হুযূর গাউসে পাক নিজেই বর্ণনা করেছেন, "মায়ের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে আমি কাফেলার সাথে বাগদাদ অভিমুখে রওনা হলাম। হামদান ছেড়ে অল্প কিছুদূর অগ্রসর হতেই অশ্বারোহী ৬০ জনের সশস্ত্র ডাকাত দল আমাদের কাফেলার উপর চড়াও হলো। কাফেলার মালসামগ্রী ও টাকা-পয়সা সবই ছিনিয়ে নিলো। এরপর আমার দিকে এগিয়ে এসে আমাকে বললো- "হে বালক! তোমার নিকট কিছু আছে কি?" আমি মায়ের উপদেশ মোতাবেক বললাম, "হ্যাঁ, আমার নিকট ৪০টি স্বর্ণমুদ্রা আছে।" একথা শুনে তার বিশ্বাস হলো না। সে আমাকে ধরে তাদের সর্দারের নিকট নিয়ে গেলো। ডাকাত সর্দার আমাকে কর্কশ ভাষায় বললো, "তোমার নিকট কি আছে? আমি বললাম, "চল্লিশটি দিনার। আমার আম্মাজান দিনারগুলো আমার বগলের নীচে জামার সাথে সেলাই করে দিয়েছেন। আর বলেছেন, আমি যেন কোন অবস্থায় মিথ্যা না বলি। আমি মায়ের আদেশ পালন করেছি।"

গাউসে পাকের মুখ মুবারকে একথা শুনে ডাকাত সর্দারের মনের পট পরিবর্তিত হয়ে গেলো, সে কেঁদে ফেললো। আর বললো, "হায়, এ ছোট বালক তার মায়ের সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করেনি। আর আমরা দীর্ঘদিন যাবৎ আল্লাহর সাথে ওয়াদা ভঙ্গ করে আসছি। আল্লাহর কত বান্দার জান-মাল হনন ও হরণ করেছি।" সাথে সাথে সে তার দলবলসহ গাউসে পাকের পায়ে লুটিয়ে পড়লো এবং তাঁর হাতে খালেস নিয়্যতে তাওবা করে খাঁটি মু'মিনে পরিণত হলো। উল্লেখ্যে, এ ডাকাত সর্দারের নাম আহমদ বদভী এবং সে ও তার দলের এ ষাটজন ছিলো গাউসে পাউসে পাকের প্রথম মুরীদান।

মাদরাসা-এ নেয়ামিয়ায় ভর্তি ও অধ্যয়ন

হুযূর গাউসে পাক ৪০০ মাইল পথ অতিক্রম করে ৪৮৮ হিজরীতে, অর্থাৎ ১৮ বছর বয়সে বাগদাদের বিশ্ববিখ্যাত দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'মাদরাসা-ই নেযামিয়া'য় ভর্তি হন। এখানে দীর্ঘ ৮ বছর কঠোর অধ্যবসায়ের মাধ্যমে তাফসীর,হাদীস, ফিক্বহ, তাসাউফ, আরবী সাহিত্য ইত্যাদি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন।

পঁচিশ বছর বয়সে তিনি শরীয়তের ১৩ টি শাখায় ও তরীক্বতের বিভিন্ন মক্বামের যাবতীয় জ্ঞানার্জন সমাপ্ত করেন। বলাবাহুল্য,তখন মাদরাসা-ই নেযামিয়ার যুগশ্রেষ্ঠ বরেণ্য মুফাস্‌সির, মুহাদ্দিস ও শিক্ষকমন্ডলী শিক্ষা দান করতেন। তন্মধ্যে সাহিত্যিক হাম্মাদ ইবনে মুসলিম, মুহাদ্দিস মুহাম্মদ ইবনে হাসান বাক্বেল্লানী ও ফক্বীহ কাযী আবূ সা'ঈদ মাখযূমী আলায়হির রাহমাহ

www.sunnibarta.com

তো শ্রেষ্ঠ ওলীও ছিলেন। হুযূল গাউসে পাকে তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ করে ত্বরীক্বতের জ্ঞানর্জন এবং রিয়াযতও আরম্ভ করেন। এভাবে তিনি একদিকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী আলিম-ই দ্বীন হয়েছিলেন, অন্যদিকে তরীক্বতের অনেক উচ্চ আসনেও আসীন হন তিনি বলেছেন-

درست العلم حتى صرت قطبا
ونلت السعد من مولى الموالى -

অর্থাৎ- আমি শিক্ষার্জন কিংবা শিক্ষাদান করতে করতে বেলায়তের উচ্চতর স্তর, 'কুত্ত্ব'-এর মর্যাদায় পৌছে গেছি। আর মহান মুনিব আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আমি এ সৌভাগ্য লাভ করেছি। [ক্বসীদা-ই গাউসিয়া শরীফ]

কঠোর রিয়াযতে মনোনিবেশ ও গাউসিয়াতে কুবরা অর্জন

তিনি আরো দীর্ঘ পঁচিশ বছর ত্বরীক্বতের কঠোর রিয়ায়তে রত হয়েছিলেন এবং ৫০ বছর বয়সে গিয়ে, ৫২১ হিজরীতে সংসারী হতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ থেকে নির্দেশপ্রাপ্ত হন ও তা পালন করেন।

হুযূও-ই আক্রাম এরশাদ করেন, "যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর সাথে যুদ্ধ করা হচ্ছে ছোটতর জিহাদ। নাফসের সাথে জিহাদ করা হচ্ছে বড় জিহাদ। অর ষড়রিপুর সমষ্টি হচ্ছে নাফ্স। 'নাফসে আম্মারাহ্' (মন্দ কাজের নির্দেশাদাতা) হচ্ছে অতি শক্তিশালী। সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য দরকার কঠোর সাধনা। আর যথানিয়মে এ কঠোর সাধনা হচ্ছে ত্বরীক্বতের কাজ। এজন্য দরকার কোন ওলী ও পীরের সান্নিধ্য। এ করণেই আল্লাহ তা'আলা ক্বোরআনে এরশাদ করেছেন- "ওয়াবতাগূ-ইলায়হিল ওসীলাহ্" (এবং তোমারা তার দিকে ওসীলা বা মাধ্যম তালাশ করো)। এ দুটি আয়াতে কামিল পীরের হাতে বায়'আত গ্রহণের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। [সূত্র- তাফসীরে-ই রুহুল বয়ান]

সুতরাং হুযূর গাউসে পাক সর্বপ্রথম হযরত আবূ সা'ঈদ মাখযূমীর হাতে বায়'আত গ্রহণের মাধ্যমে আল্লাহর এ নির্দেশ পালন করলেন। তারপর থেকে শুরু করলেন কঠোর রিয়াযত বা সাধনা।

উল্লেখ্য, হুযূর গাউসে পাক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা ছাত্রজীবনেই হযরত আবূ সা'ঈদ মাখযুমী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর নিকট বায়'আত গ্রহণ করে ত্বরীক্বতের রিয়াযত আরম্ভ করেন। ৫১৩ হিজরীর ১ মুহাররম তিনি ওফাত পান। তাঁর জীবদ্দশায় তিনি হুযূর গাউসে পাককে খিলাফতের খিরক্বাহ্ প্রদান করে যান। এ প্রসঙ্গে হুযূর গাউসে আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলঅ আনহু বলেন, "একদিন আমার খুব ক্ষুধা পেলো। তখন আমার পীর-মুর্শিদ হযরত মাখযূমী বললেন, তুমি আমার বাড়ি চলো। একথা বলে তিনি বাড়িতে চলে গেলেন। কিন্তু আমার লজ্জাবোধ হওয়ার কারণে আমি যেতে ইতস্ততা বোধ করলাম। তখন হযরত খাদ্বির আলায়হিস সালাম এসে আমাকে সেখানে যেতে তাকিদ দিলেন। আমার মুর্শিদের বাড়ীতে গিয়ে দেখলাম তিনি আমার জন্য ঘরের দরজায় অপেক্ষা করছেন। আমাকে দেখে বললেন, 'আবদুল ক্বাদির! আমার দাওয়াত দেওয়া যথেষ্ট ছিলো না? আবার হযরত খাদ্বির আলায়হিস সালামকেও বলতো হলো? এ কথা বলেই তিনি আমার জন্য খাবার নিয়ে আসলেন এবং নিজ হাতে আমাকে খাওয়াতে লাগলেন। আমি অনুভব করতে লাগলাম- এটা শুধু খাবারই ছিলো না, বরং তার হাতের প্রতিটি লোকমায় আমার অন্তরদৃষ্টি আলোকিত হয়ে যেতে লাগলো। এর পরে তিনি আমাকে 'খিরক্বাহ' বিশেষ পোষাক) পরিয়ে দিলেন। এ খিরক্বাহ্ পরার পর থেকে আমার উপর নানাবিধ রহমত, বরকত ও তাজাল্লী অধিক পরিমাণে প্রকাশ পেতে লাগলো।

তাছাড়া, হযরত আবূ সা'ঈদ মাখযূমীর বাগদাদ শরীফেল 'বাবুশ্ শায়খ' নামক স্থানে একটি উচ্চমানের মাদরাসাও ছিলো। ইনতিক্বালের পূর্বে তিনি মাদরাসার দায়িত্বভারও হুযূর গাউসে পাকের উপর অর্পণ করে যান। ৫১৩ থেকে ৫৬১ হিজরীতে ওফাতের পূর্বে পর্যন্ত তিনি এ মাদরাসা পরিচালনা করে যান। বলাবাহুল্য, ইসলামের যাবতীয় বিষয়ে শিক্ষা লাভ করে অগণিত আলিম বের হন এ মাদরাসা হতে। উক্ত মাদরাসা প্রাঙ্গণেই হুযূর গাউসে পাকের মাযার শরীফ অবস্থিত। এর পাশে রয়েছে হাজার হাজার কিতাবসমৃদ্ধ লাইব্রেরি। এ সময়ে তিনি মাদরাসারও বহু সংস্কার এবং সম্প্রসারণ করেছিলেন।

ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পঁচিশ বছর বয়সে তিনি জাহেরী ইলম অর্জন সমাপ্ত করে অপ্রতিদ্বন্দ্বী আলিম হন। তাঁর পরবর্তী ২৫ বছর যাবৎ বাতেনী জ্ঞানর্জন ও রিয়াযতে অতিবাহিত করেন। এ রিয়াযতকালে তিনি আধ্যাত্মিকতার বহু কষ্টকর সোপান

পাড়ি দেন। এক সময় তিনি শহর ছেড়ে ইরাকের বিরান উপত্যকাগুলোতে একাকী কালযাপন করতে থাকেন এবং কঠোর রিয়াযতে মশগুল হন। এ রিয়াযতকালের সূচনাতেই হযরত খাদ্বির আলায়হিস সালাম তার সঙ্গ দেন। তিনি আত্মপ্রকাশ করে হুযূর গাউসে পাক থেকে ওয়াদা নিলেন যেন তিনি তার বিরোধিতা না করেন, বরং তার দিক-নির্দেশনানুসারে রিয়াযত করতে থাকেন। সুতরাং এরপর একদিন এসে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় হুযূর গাউসে পাককে বসিয়ে তিনি পুনরায় না আসা পর্যন্ত ওখানেই রিয়াযত করতে বলে চলে যান। দীর্ঘ এক বছর পর তিনি পুনরায় এসে দেখা দিলেন এবং পুনরায় একই নির্দেশ দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যান। এভাবে পরপর তিন বছর যাবৎ ওই স্থানে তাঁকে রিয়াযত করান। এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে দুনিয়ার অগণিত প্রবৃত্তি বিভিন্ন মনোরম সূরতে এসে সেদিকে হুযূর গাউসে পাককে ফেরাতে চেষ্টা করে; কিন্তু আল্লাহ্‌র অনুগ্রহক্রমে এগুলো তাঁকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত করতে পারেনি; বরং কঠোর বিরোধিতার মাধ্যমে তিনি সেগুলোর প্রত্যেকটা জয় করলেন।

এ তিন বছর পর তিনি নাফসকে আরো কঠিন কষ্টের ভাট্টিতে নিক্ষেপ করেন। এক বছর যাবৎ তিনি পানি পান করা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করলেন। শুধু জঙ্গলী শাক-পাতা খেয়ে দিনাতিপাত করতে লাগলেন। তারপর এক বছর যাবৎ শুধু পানি পান করে দিনাতিপাত করেন। খাদ্য মোটেই গ্রহণ করেন নি। তৃতীয় বছর পানাহার ও শয়ন পর্যন্ত পরিহার করেন।

যে সময়সীমার মধ্যে হুযূর গাউসে পাক রিয়াযত ও নাফসের বিরুদ্ধে সাধনার কঠিন সোপানগুলো অতিক্রম করেছিলেন, তখন শয়তানের ফিৎনাপূর্ণ অব্যাহত হামলা চলতে থাকে। কিন্তু প্রতিটি মোড়ে শয়তান তাঁর নিকট পরাজিত হতে থাকে। এদিকে তিনি রূহানিয়াতের উঁচু থেকে উঁচুতর স্তরে পৌঁছতে থাকেন। তার এ মর্যাদার শীর্ষে পৌঁছানো শয়তানের বরদাশ্‌ত হচ্ছিলো না। একদিন শয়তান হুযূর গাউসে পাককে বললো, "আপনিতো আমাকে ও আমার দলবলকে পরাস্ত করে ফেলেছেন, আমাদের কোন ক্ষমতাই আপনার নিকট চলছে না। সুতরাং আমরা আপনার নিকট অনুগত হয়ে থাকতে চাই।" হুযূর গাউসে পাক বললেন, "লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা-বিল্লাহ! আমি তোর কোন কথাই বিশ্বাস করি না। যা এখান থেকে! ইত্যবসরে গায়ব থেকে একটি হাত বের হয়ে শয়তানের শাথার সজোরে আঘাত করলো। এর চোটে সে পালিয়ে যেতে বাধ্য হলো।

আরেকবার শয়তান আগুনের লেলিহার শিখা নিয়ে হুযূর গাউসে পাককে হামলা করলো। হুযূর গাউসে পাক 'আউযুবিল্লাহ' পড়লেন। সে পালিয়ে গেলো কিন্তু আবার এসে হামলা করার জন্য উদ্যত হলো। তখন একজন অশ্বারোহী আত্মপ্রকাশ করলেন এবং তাঁর হাতে একটি তলোয়ার দিয়ে গেলেন। এটা দেখে শয়তান পালিয়ে বাঁচলো। কিন্তু সে তৃতীয়বার আরেক ফাঁদ রচনা করে হুযূর গাউসে পাকের সামনে আসলো। সে এবার এসে একেবারে হতাশাগ্রস্তের আকারে বসে কাঁদতে লাগলো। হুযূর গাউসে পাক তার দিকে কঠোর দৃষ্টিতে তাকালেন। শয়তান বললো, "আপনি আমার দিকে এভাবে দেখছেন কেন? আমি তো আপনার দিক থেকে সম্পূর্ণরূপে হতাশ হয়ে গেছি।" হুযূর গাউসে পাক বললেন, "আমি তোকে মোটেই বিশ্বাস করি না।" শয়তানের বিরুদ্ধে এমন দৃঢ়তা দেখে শয়তান এবার জাহেরীভাবে হামলা বাদ দিয়ে তার বিরুদ্ধে গোপনে 'শির্কে খাফী' (গোপন শির্ক) -এর অগণিত জাল বুনতে লাগলো। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁকে প্রত্যেকবার রক্ষা করেছেন। এবার সে তাকে মাখলূক্বের ভালবাসা ও পার্থিব আত্মীয়তার প্রতি মনোনিবেশ করাতে চাইলো। সেদিকেও তিনি ভ্রুক্ষেপ করলেন না। এতেও শয়তান অকৃতকার্য হলো। আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহক্রমে এ ধরণের সব ক'টি হামলার সফল মোকাবেলা করে তিনি সফল হন। এবার শয়তান তাকে জ্ঞানগত বিষয়ে প্ররোচনা দিতে লাগলো। এ সম্পর্কে একটি ঘটনা অতি প্রসিদ্ধ। একদা হুযূর গাউসে পাক এমন এক মরুভূমি বা জঙ্গলে চলে গেলেন, যেখানে খাদ্য ও পানীয়ের নাম-নিশানা পর্যন্ত ছিলো না। কয়েক দিন যাবৎ তিনি একটানা ইবাদত-রিয়াযত করার পর তার ক্ষুধা ও পিপাসা হলো। কিন্তু দেখতে দেখতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হলো এবং মুষলধারে বৃষ্টি হলো। তিনি তৃপ্তি সহকারে বৃষ্টির পানি পান করলেন। ফলে মেঘের ফাকে এক উজ্জ্বল আলো দেখতে পেলেন এবং তা আসমানের প্রান্তগুলোতে প্রসারিত হলো। আর তা থেকে আওয়াজ আসতে লাগলো, "আবদুল ক্বাদির! আমি তোমার খোদা! আজ থেকে আমি তোমার জন্য হারাম জিনিষগুলো হালাল করে দিলাম। নামাযও ক্ষমা করে দিলাম।" তিনি এটা শুনতেই পড়তেন,

www.sunnibarta.com

"আউযুবিল্লাহি মিন্‌শ্‌ শায়ত্বানির রাজীম। (অর্থাৎ আমি ধিক্কৃত শয়তান থেকে আল্লাহ্‌রই আশ্রয় গ্রহণ করলাম। ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম।" তৎক্ষণাৎ ওই আলো নিভে গেলো ও সেখানে ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়লো। আর আওয়াজ আসলো, "আবদুল ক্বাদির! তোমাকে তোমার ইলম রক্ষা করেছে। অন্যথায় আমি তোমার মতো অনেক দরবেশ ও ইবাদতপরায়নকে এভাবে পথভ্রষ্ট করেছি।" তিনি জবাব দিলেন, হতভাগা শয়তান! আমাকে আমার রব রক্ষা করেছে; আমার ইলম নয়।" এটা শুনে শয়তান একেবারে হতাশ হয়ে গেলো।

মোটকথা, এমন কঠিন থেকে কঠিনতর এবং অত্যন্ত বিপজ্জনক মনযিলগুলো অতিক্রম করার পর আল্লাহ তা'আলা তার সামনে তার বাতিনকে প্রকাশ করে দিলেন। এবারও তিনি মানবীয় ইচ্ছার বহু পঙ্কিলতা দেখতে পান। সেগুলো থেকেও তিনি পবিত্রতা অর্জন করলেন।

মাতৃগর্ভ থেকে ওলী হয়ে দুনিয়া এসেও তিনি অসাধারণ রিয়াযত ও ইবাদত করেছেন। তিনি চল্লিশ বছর যাবৎ নিয়মিতভবে এশার ওযূ দিয়ে ফজরের নামায পড়েছেন। অর্থাৎ সারারাত জেগে ইবাদত করেছেন। দীর্ঘ পনের বছর যাবৎ এশার নামাযের পর এক খতম ক্বোরআন পড়তেন। দীর্ঘ পঁচিশ বছর যাবৎ ইরাক্বের পাহাড়ে ও জঙ্গলে কঠিন রিয়াযত করেছেন। এভাবে তিনি 'গাউসুল আ'যম' ও 'কুত্বুবুল আকতাব'-এর উচ্চ আসনে আসীন হলেন। তারপর বাগদাদ শরীফে অবস্থান করার মনস্থ করলেন। কিন্তু পারিপার্শ্বিক নানা অন্যায়- অবিচার রাশি- রাশি পাপাচারের অবস্থা দেখে তিনি বিরক্ত হয়ে একদা বাগদাদ ছেড়ে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন, যাতে নিজের দ্বীন ও ঈমানকে অনায়াসে হিফাযত করতে পারেন। কিন্তু তিনি গায়েবী আওয়াজ শুনতে পান -

كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر -

(তরজমাঃ তোমরা হলে শ্রেষ্ঠ উম্মত, যারা মানুষের কল্যাণার্থে বের হয়; তোমরা ভাল কাজের নির্দেশ দেবে এবং মন্দ কাজে বাধা দেবে।)

এই আহবানে বলা হয়েছে- 'মাখলূকের উপর তোমার উপর বড় হক রয়েছে। তাদেরকে হিদায়ত করা তোমার দায়িত্ব। তুমি ওখানেই থাকো। আল্লাহ সর্বশক্তিমান তোমার দ্বীন ও ঈমানকে হিফাযত করবেন। এ গায়েবী আহবান শুনে হুযূর গাউসে পাক বাগদাদেই স্থায়ীভাবে বসবাস করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তারপর আরম্ভ করলেন দ্বীন-মাযহাবের খিদমত, সমাজ-সংস্কার। 'গাউসুল আ'যম' হিসেবে রূহানী জগতের দায়িত্বাবলীও তিনি এখান থেকে পরিচালনা করতেন। 'বাহজাতুল আসরার' গ্রন্থখানা পাঠ করলে এ সম্পর্কে সম্যক অবগত হওয়া যাবে।

৫০ বছর বয়সে তিনি হুযূর-ই আকরামের ইঙ্গিতে শাদী করে সংসার-জীবনের সূচনা করেন। তাঁর চার বিবির ঘরে সর্বমোট ৪৯ জন ছেলেমেয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরাও জগৎ বিখ্যাত বুযুর্গ ছিলেন এবং দ্বীন ও মাযহাবের বহু খিদমত আঞ্জাম দেন।

ইতোপূর্বে হযরত শায়খ আবদুল ক্বাদির জীলানী 'মুহিউদ্দীন' (ইসলামকে পুনরায় জীবিতকারী) উপাধি লাভ করেন। ঘটনাটিও প্রসিদ্ধ। তিনি ৫১১ হিজরীর এক জুমাবারে বাগদাদ শহরের দিকে যাচ্ছিলেন। রাস্তার পাশে জরাজীর্ণ ও শীর্ণকায় এক বৃদ্ধকে পড়ে থাকতে দেখতে পান। লোকটি হুযূর গাউসে পাককে সালাম দিয়ে বললো, "আমি শক্তিহীন আমাকে ধরে তুলুন।" তিনি তাকে তুলতে ধরার পর সে সবল সুস্থ হয়ে গেলো। আর আরয করলো, "আমি আপনার নানার ধর্ম ইসলাম। মানুষের আকারে আপনার সামনে পেশ হয়েছি। আমার মতো ইসলাম ধর্ম দুর্বল হয়ে পড়েছে। আপনার হাতের স্পর্শে সেটা পৃথিবীতে পুনরায় নবজীবন লাভ করলো।" এদিকে আল্লাহ তা'আলা তার 'মহিউদ্দীন'(ইসলামকে পুনর্জীবিতকারী) উপাধিটা প্রসিদ্ধ করে দিলেন। তিনি জুমা পড়ানোর জন্য জামে মসজিদে প্রবেশ করতেই সবাই তাঁকে 'মুহিউদ্দিন' বলে সম্বোধন করতে লাগলো।

তাঁর গাউসিয়াতের মহামর্যাদা এও ছিলো যে, তাঁর কদম শরীফ সমস্ত ওলীর গর্দানের উপর। ৫৫৯ হিজরীতে, অর্থাৎ তাঁর ইনতিক্বালের তিন বছর পূর্বে এক রাতে তিনি বাগদাদে ওয়ায করছিলেন। ওই মজলিসেই ওয়াযের এক পর্যায়ে বললেন-

قدمى هذه على رقبة كل ولى الله -

(আমার এ কদম প্রত্যেক ওলীর গর্দানের উপর)। এটা শুনার সাথে সাথে উপস্থিত ও অনুপস্থিত সকল ওলী নিজ নিজ গর্দান ঝুঁকিয়ে দিয়েছিলেন। হযরত খাজা মু'ঈন উদ্দীন চিশতী আলায়হির রাহমাহ তখন খোরাসানের এ পর্বতের গুহায় ধ্যানমগ্ন ছিলেন। তিনি

www.sunnibarta.com

সেখান থেকে বাগদাদের ওই ঘোষণা শুনতে পান এবং সাথে সাথে গর্দান ঝুঁকিয়ে দিলেন বললেন-

بل قدمك على راسى و عينى –

(অর্থাৎ আপনার চরণযুগল বরং আমার মাথায় ও চোখে স্থাপন করে নিলাম)।

হুযূর গাউসে পাকের ওয়ায মাহফিলে ৬০-৭০ হাজার শ্রোতা হতো। এখানেও তার কারামত ছিলো আশ্চর্যজনক। প্রথমতঃ তাঁর আওয়াজের স্বাভাবিক শব্দ এত বড় বড় জমায়েতের সামনের লোকেরা যেভাবে শুনতে পেতেন, তেমনি ভাবে মজলিসের শেষপ্রান্তের লোকেরাও সমানভাবে শুনতে পেতেন। দ্বিতীয়তঃ তাঁর ওয়াযের প্রভাব এতো প্রখর ছিল যে, সাথে সাথে তা শ্রোতাদের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করতো এবং তারা আল্লাহ ও রসূলমূখী হয়ে মুত্তাক্বী-পরহেযগারদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতেন। এর বহুবিধ কারণের মধ্যে প্রধানতম কারণ ছিলো এ যে, খোদ হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নযোগে তাঁর মুখে সাতবার এবং এর পরবর্তীতে হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুল করীম ছয়বার থুথু শরীফ দিয় ওয়াজ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এরপর থেকে তাঁর ওয়াযে অপূর্ব ও অবর্ণনীয় তা'সীর বা প্রভাব দেখা দিলো। তাছাড়া, তার অন্যান্য খোদাপ্রদত্ত যোগ্যতার উপর 'মদীনাতুল ইলম' সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও 'বাবু মদীনাতিল ইলম' রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র এ অমূল্য বদানত্য সোনায় সোহাগা হয়েছিলো। তিনি ইসলামী বিশ্বে ত্বরীক্বাহ-ই ক্বাদেরিয়ার প্রবর্তন করেন। চিশতিয়া, নক্শবন্দিয়া ও মুজাদ্দেদিয়া তরীক্বাও তার হাতে প্রবর্তিত হয়।

আ'লা হযরত বলেন- অর্থাৎ চিশ্‌ত, বোখারা, ইরাক ও আজমীর।এমন কোন ক্ষেত্র (সিলসিলাহ্) রয়েছে, যাতে গাউসুল আ'যম জীলানী কুদ্দিসা সিররুকা, আপনার বৃষ্টি বর্ষিত হয়নি। অর্থাৎ সব ক'টি তরীক্বা আপনারই বদান্যতায় প্রবর্তিত হয়েছে। [হাদাইক্বে বখশিশ]

তিনি তদানীন্তনকালে যে সব বদ-মাযহাব ও ভ্রান্ত ফির্ক্বা মাথাচাড়া দিয়েছিলো সব ক'টির বিদঘুটে চেহারার মুখোশ উন্মোচন করেন এবং স্থায়ীভাবে খন্ডন করেন। যেমন খারেজী, রাফেজী ও মু'তাযিলা ইত্যাদি ভ্রান্ত সম্প্রদায়গুলো মাথাচাড়া দিয়ে সরলপ্রাণ মুসলমানদের হৃদয় থেকে আল্লাহ ও রসূলের ভালবাসা দূরীভূত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলো। হুযূর গাউসে আ'যম অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে তাদের সবাইকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। তাদেরকে চিহ্নিত ও দমিত করে তদস্থলে আহলে সুন্নাতের আক্বীদাকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাছাড়া, বাগদাদের রাজপ্রাসাদ থেকে আরম্ভ করে সমাজের সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত তার সংস্কারের বরকতমন্ডিত ছোঁয়া পেয়ে ধন্য হয়েছিলো। রাজনৈতিকভাবেও মুসলমানগণ সারা বিশ্বে পুনরায় উঠে দাঁড়ানোর সুযোগ পেয়েছিলো। অগণিত মানুষ প্রত্যক্ষ কিংবা রূহানীভাবে তার বেলায়তী ক্ষমতার সাহায্য পেয়ে ধন্য হয়েছে এবং হচ্ছে।

হুযূর গাউসে পাকের লিখনীগুলোও তার জ্ঞান-গভীরতা এবং অসাধারণ বেলায়তের উজ্জ্বল স্বাক্ষর। নির্ভরযোগ্য বর্ণনাদি অনুসারে হুযূর গাউসে পাক ৬৯ টি কিতাব রচনা করেছেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কিতাবগুলো সবিশেষ প্রসিদ্ধ - ১. জালাউল খাতির ফিল বাত্বিনি ওয়ায যাহির, ২.আল- ফাতহুর রাব্বানী ওয়াল ফায়দুর রাহমানী (ফুতূহুল গায়ব), ৩. আল-গুনিয়াহ্ লিত্বা-লিবী ত্বারীক্বিল হক্ব (সংক্ষেপে গুনিয়াতুত তালিবীন), ৪. সিররুল আসরার ওয়া মাযহারুল আনওয়ার ফী-মা ইয়াহতাজু ইলায়হিল আবরার, ৫. আদাবুস্ সুলূক ওয়াত্ তাওয়াস্সুলু ইলা মানাযিলিল মুলূক, ৬. ইগাসাতুল আরিফীন ওয়া গায়াতুল ওয়াসিলীন, ৭. দু'আউ ওয়া আওরাদুল ফাতহিয়্যাহ; দো'আ-উল বাসমালাহ, ৮. আল- হিযবুল কবীর, ৯. আওরাদুল আইয়্যামি ওয়াল আওক্বাত, ১০. রিসালাতুন ফিল আসমা-ইল আযীমাহ, ১১. আত্বত্বরীক্ব ইলাল্লাহ্, এব ১২. কিতাবুন ফিল ফিক্বহি ওয়াত তাসাওফ।

হুযূর গাউসে পাক কাব্য রচনায়ও দক্ষহস্ত ছিলেন। তাঁর 'ক্বসীদাহ-ই লামিয়াহ' (ক্বসীদাহ-ই গাউসিয়া) বিশ্বে খুব প্রসিদ্ধ এবং অতি ভক্তি সহকারে পঠিত হয়। তা ছাড়া, তার 'ক্বসীদাহ-ই বাইয়্যাহ'ও উল্লেখযোগ্য।

মোটকথা, হুযূর গাউসে পাকের পূর্ণ জীবদ্দশাই অলৌকিকতায় পূর্ণ। তাঁর প্রতিটি বিষয়ে ও কাজে কারামতই প্রকাশ পেয়েছে। এ কারণে তাঁর জীবনে যত বেশী কারামত প্রকাশ পেয়েছে পৃথিবীর অন্য কোন ওলীর এত কারামত প্রকাশ পায়নি। ইমাম ইয়াফে'ঈ বলেছেন, তাঁর কারামতের আধিক্য 'তাওাতুর' এর সীমা পর্যন্ত পৌছে গেছে। অর্থাৎ তার জীবদ্দশা থেকে এ পর্যন্ত প্রতিটি যুগে এতবেশী কারামত প্রকাশ পেয়েছে যে, সেগুলো গণনা করাও সম্ভবপর নয়। আর এতগুলো বর্ণনাকরী একসাথে কোন মিথ্যা ও বানোয়াটের আশ্রয়

নেয়া সম্ভব নয়। শায়খ আলী ইবনে হায়তী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বলেছেন, "আমি হুযূর গাউসে পাকের সমসাময়িক কোন ওলীর মধ্যে এত বেশী কারামত দেখিনি। দারা শিকূ এবং মুহাদ্দিসে দেহলভীও একথা তাদের রচনাদিতে উল্লেখ করেছেন। নিম্নে আরো কিছু কারামত পত্রস্থ হলো -

এক. গাউসে যামানের ভবিষ্যদ্বাণী

হুযূর গাউসে পাকের সহপাঠি আবদুল্লাহ তামীমী বর্ণনা করেন- ছাত্র জীবনে আমরা ওই সময় বাগদাদে এক ওলী ছিলেন, তাকে লোকেরা 'গাউস' বলে ডাকতো। তার বড় কারামত ছিলো যে, তিনি ইচ্ছা করলে হঠাৎ অদৃশ্যমান হয়ে যেতেন,আবার ইচ্ছা করলে হঠাৎ দৃশ্যমান হয়ে যেতেন। সুতারাং আমি (আবদুল্লাহ তামীমী), ইবনে সাক্বা ও শায়খ আবদুল ক্বাদির জীলানী ওই গাউসের দরবারে যাবার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করি। যাত্রাকালে পথিমধ্যে ইবনে সাক্বা বললো, "আমি গাউস সাহেবকে এমন প্রশ্ন করবো যার জবার দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব হবে না।" আমি (আবদুল্লাহ তামীমী) বললাম, আমিও একটি প্রশ্ন করবো, দেখি তিনি কী জবাব দেন। কিন্তু হুযূর গাউসে পাক শায়খ-ই জীলানী বললেন, "নাউযুবিল্লাহ! আমি কোন প্রশ্ন করার জন্য যাচ্ছি না; বরং তার দীদারের বরকত লাভের জন্য যাচ্ছি। আমি শুধু তার দীদারের জন্য অপেক্ষা করবো।" আবদুল্লাহ তামীমী বললেন,"আমরা ওই যামানার গাউসের দরবারে দিয়ে দেখলাম তিনি আসনে নেই। কিছুক্ষণ পর দেখতে পেলাম তিনি তার আসনে উপবিষ্ট। তিনি ইবনে সাক্বার দিকে কঠোর দৃষ্টিতে দেখে বললেন, "ইবনে সাক্বা! তোমার বিনাশ হোক! তোমার প্রশ্নের জবাব নাও। আমি তোমার মধ্যে কুফরীর অগ্নিশিখা দেখতে পাচ্ছি। তারপর তিনি আমার (আবদুল্লাহ) দিকে তাকালেন। আর বললেন, 'নাও তোমার প্রশ্নের জবাবও। তুমি কান পর্যন্ত দুনিয়ার ধূলিবালিতে নিমজ্জিত হয়ে যাবে। এগুলো তোমাদের বেয়দবীর পরিণাম। তারপর তিনি হুযূর গাউসে পাকের দিকে তাকালেন আর স্নেহভরে ও সম্মানপূর্বক বচনে বললেন, "আবদুল ক্বাদির! আপনি উত্তম শিষ্টাচারের মাধ্যমে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে খুশী করেছেন। আমি দেখতে পাচ্ছি যে, আপনি অবিলম্বে বাগদাদের ওয়াযের মঞ্চে কুরসীতে বসে ঘোষণা দেবেন- 'আমার এ কদম সমস্ত ওলীর গর্দানের উপর।"

গাউসে যামানের ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবতার রূপ নিয়েছিলো। ইবনে সাক্বা খ্রিষ্টান হয়ে মরেছিলো। আর আবদুল্লাহ তামীমী সিরিয়ার ওয়াকফ মন্ত্রনালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে পার্থিব প্রাচূর্যে আকর্ণ ডুবে গিয়েছিলো। আর শায়খ আবদুল ক্বাদির জীলানী? তিনি বাগদাদ থেকে ঘোষণা দিয়েছিলেন- "আমার এ কদম প্রত্যেক ওলীর গর্দানের উপর।"

দুই .চোরকে কুত্বে পরিণত করে দিয়েছিলেন

পবিত্র বাগদাদের এক দুর্ধর্ষ চোর ছিলো। সে মনে করলো হুযূল গাউসে পাকের ঘওে মূল্যবান সম্পদ আছে। সুতরাং সে এক গভীর রাতে হুযূর গাউসে পাকের ঘরে চুরি করার উদ্দেশ্যে প্রবেশ করলো। কিন্তু ঘরের কোথাও কিছু দেখতে পেলো না। হতাশ হয়ে বের হয়ে যাবার জন্য মনস্থ করলো কিন্তু সে চোখের দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেললো। তাই নিরাশ হয়ে ঘরের এক কোণায় বসে পড়লো। আশা করেছিলো হয়তো ভোরে রোদের আলোতে পথ খুঁজে পাবে।

এদিকে তখন হযরত খাদ্বির আলায়হির সালাম হুযূর গাউসে পাকের নিকট এসে বললেন, "নিহাওয়ান্দের কুত্বব ইনতিকাল করেছেন। আজ রাতের মধ্যেই কাউকে সেখানকার কুত্বব নিয়োগ করুন! কারণ, যামানার গাউস, কুত্বব,আবদাল আওতাদ ও আবরার নিয়োগ করার দায়িত্ব তাকে 'গাউসুল আযম'-এর হাতে। হযরত শায়খ আবদুল ক্বাদির জীলানী হলেন- তখনকার এবং বর্তমানকার এবং ইমাম মাহদী শুভাগমন পর্যন্ত সময়সীমার জন্য গাউসুল আ'যম। [নুজহাতুল ফাত্বি ও মলফুযাত-ই আলা হযরত ইত্যাদি]

সুতরাং হুযূর গাউসে পাক খাদিমের মাধ্যমে ওই ঘর থেকে চোরটিকে ডেকে এনে নেওয়ান্দের কুত্বব বানিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। উল্লেখ্য, চোরটি এসেছিলো দুনিয়ার সম্পদ চুরি করার জন্য আর হুযুর গাউসে পাক তখনি তাকে জামালী ফয়যপূর্ণ কৃপাদৃষ্টি দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে বেলায়তের সোপানগুলো অতিক্রম করিয়ে 'কুত্বব -এর মর্যাদায় আসীন করে দিলেন।

উল্লেখ্য, ত্বরীক্বত ও মা'রিফাতের উর্ধ্বতন দশম স্তর হচ্ছে 'কুত্বব'- এর। এর উপরে কুত্ববুল আক্বতাবের স্তর, এর উপরে গাউসে যামান, এর উপরে 'গাউসুল আ'যম-এর মহান পদ। আর তিনিই 'গাউসুল আ'যম,যিনি একটি মাত্র কৃপাদৃষ্টিতে একজন পাপী মু'মিন চোর) কেও কুত্ববের আসনে পৌঁছাতে পারেন।

আরো উল্লেখ্য যে, বেলায়তও তিনভাবে উপার্জন করা যায়- ১. বেলায়তে আত্মা'ঈ অর্থাৎ মাদারযাদ ওলী, ২. বেলায়তে ফয়যী, কোন ওলীর কৃপাদৃষ্টিতে প্রাপ্ত বেলায়ত, এবং ৩. বেলায়তে কাসাবী, অর্থাৎ নিজের রিযায়ত সাধনার মাধ্যমে অর্জিত বেলায়ত। এজন্যই বলা হয়েছে -

"ওলীগণের দরবারে একটা মাত্র মুহূর্ত বসা শত বছরের বে-রিয়া বা নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদত অপেক্ষা উত্তম।"

"ওলীর কৃপাদৃষ্টির প্রভাবে হাজারো মানুষের তাক্বদীর বদলে যেতেও দেখেছি"।

তিন. বাঘকে খেল গাউসে পাকের পোষা কুকুর

আহমদ জামী নামে এক ভন্ড তাপস ছিলো। সে সাধনা ও যাদুর বলে একটি বাঘকে বশীভূত করে নিয়েছিলো। সে সেটার পিঠে আরোহণ করে ইচ্ছামত বিচরণ করতো, তদুপরি তার হাতে থাকতো এক লাঠিরূফে বিষধর সাপ। তার এ অবস্থা দেখে সরলপ্রাণ লোকেরা তাকে মহা তাপস (বুযূর্গ) মনে করতো ও সম্মান করতো।

এ ভন্ড তাপস কারো নিকট যাওয়ার ইচ্ছা করলে আগে ভাগে তাকে খবর দিয়ে তার নিকট থেকে একটি গরু চেয়ে নিতো- বাঘের খোরাক স্বরূপ। সে এভাবে হুযূর গাউসে পাককেও খবর দিলো। গাউসে পাক তার বেলায়তী দৃষ্টিতে ওই ভন্ড অবস্থা অবলোকন করে নিলেন। আর ওই ভন্ডের বার্তাবাহকে বললেন, "তুমি যাও, আমি একটু পরে গরু পাঠাচ্ছি।" এদিকে ওই ভন্ড খুশীতে আটকানা। গাউসে পাকের হাদিয়া পেলে সে এবার আরো প্রসিদ্ধ হয়ে যাবে।

হুযূর গাউসে পাক একটা মোটা তাজা গরু সহকারে খাদেমকে পাঠালেন। তখন হুযূরের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলো একটি পোষা কুকুর। কুকুরটিও লেজ উঁচু করে খাদেম ও গরুর পেছনে পেছনে রওনা হলো। মোটা তাজা গরু দেখে বাগটি হুঙ্কার ছেড়ে সেটা খাওয়ার জন্য উদ্যত হলো। অমনি গাউসে পাকের পোষা কুকুরটি বাঘের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং সেটার কণ্ঠনালী ছিঁড়ে ফেললো। বাঘটি তৎক্ষণাত মারা গেলো ওই কুকুর সেটাকে চিরে টুকরো টুকরো করে খেয়ে ফেললো।

এটা দেখে তাপস ভয়ে কাঁপতে লাগলো আর দৌঁড়ে গিয়ে গাউসে পাকের কদমে লুটিয়ে পড়ে ক্ষমা চাইলো। তিনি তাকে ক্ষমা করে দিলেন এবং তাওবা করিয়ে মুরীদ করলেন। এ আহমদ জামীও কিছুদিন রিয়াযত করে কামিল মু'মিন (ওলী) হয়ে গেলেন। হুযূর গাউসে পাক ওদিকে কুকুরটিকে ইঙ্গিত করলে সেটা বমি করে দিলো। বাঘটি পুনরায় জীবিত হয়ে বনের দিকে চলে গেলো। [মু'জিযা-ই আম্বিয়া ও কারামতে আউলিয়া]

খ্রিস্টান পাদ্রীর ইসলাম গ্রহণ

একদিন ইরাকের তিনিজন খ্রিস্টান পাদ্রী হুযূর গাউসুল আ'যমের সাথে তর্কে লিপ্ত হলো। তারা বললো, "আমাদের নবী হযরত ঈসা আলায়হিস সালাম মৃতকে জীবিত করতেন। সুতরাং আমাদের নবী শ্রেষ্ঠ।

এটা শুনে হুযূর গাউসে পাক বলেছিলেন, আমাদের নবীও মৃতকে জীবিত করতে পারতেন। হযরত জাবিরের দু'পুত্রকে তিনি জীবিত করেছিলেন। উস্তনে হান্নানার মতো শুষ্ক কাঠ হুযূরে করীমের স্পর্শধন্য হলে মানুষের মতো জীবন লাভ করেছিলো ইত্যাদি। আমাদের নবী এরশাদ করেছেন "আমার উম্মতের আলিমগণ বনী ইসরাঈলের নবীর মতো।"

সুতরাং হে পাদ্রীরা! তোমরা আমার নির্দেশে মরে যাও। অমনি তারা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো। কিছুক্ষণ পর হুযূর গাউসে পাক বললেন, "তোমরা জীবিত হয়ে যাও।" তৎক্ষণাৎ তারা জীবিত হয়ে গেলো। পাদ্রীগণ তাকেও খোদা বলে সাজদা করতে চেয়েছিলো। কিন্তু হুযূর গাউসে পাক বললেন, "আমি আল্লাহর বান্দা ও আমাদের নবীর একজন উম্মত। সাজদা আমাকে নয়, আল্লাহর উপর ঈমান এনে তাকেই করো।" সুতরাং এমন কারামত দেখে তার নিকট তাওবা করে পাদ্রীরা মুসলমান হয়ে গিয়েছিলো। তিনি বুঝিয়ে দিলেন- এটা খোদা প্রদত্ত ক্ষমতা বলেই করা সম্ভব হয়েছে। এভাবে আরো (অসংখ্য) কারামত হুযূর গাউসে পাকের রয়েছে। তাঁর জীবনী পুস্তকগুলোতে এসব কারামতের অনেক গুলো লিপিবদ্ধ হয়েছে। 'বাহজাতুল আসরার' এর বঙ্গানুবাদ ইত্যাদিতে দেখুন।

ওফাত শরীফ

আপাদমস্তক কারামত হুযূর গাউসে পাক ৫৬১ হিজরীতে রবিউল আখির মাসে ওফাত বরণ করেন। তারিখ সম্পর্কে মতভেদ আছে। ১১, ১২ ও ১৭ রবিউল আখির বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)র নবী প্রেম

মুফতি মুহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দীন

কোন পর্বতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ আর সাগর বুকের হিল্লোলের মাঝেও যদি ইসলামের ও মুসলমানের ইতিহাস কেউ লিখতে বসে, সেও বাধ্য হবে তাঁর লিখনীতে হযরত আবু বকর সিদ্দিকের (রাঃ) নাম লিখতে। কারণ, তিনিই ছিলেন ইসলামের প্রথম খলীফা। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) সেই মহান বক্তিত্ব, ইতিহাসে যার নাম মহান ত্রাণকর্তা হিসেবে স্বার্ণক্ষরে লিখিত। নবীদের পর সমগ্র বিশ্বে মানুষের উপর যার অবস্থান তিনিই সিদ্দিকে আকবর (রাঃ)। ইসলামের প্রচার প্রসারের ক্ষেত্রে জানবাজি রেখে যিনি নিরলস সেবা দিয়ে সারাজীবন পরিশ্রম করেছেন তিনিই হযরত আবু বকর সিদ্দক (রাঃ)। দয়া-দানশীলতায় কোন দিকে তাঁকে পেছনে ফেলতে পারেনি কেউ। ইসলাম গ্রহণেও তিনি অগ্রগন্য। বাল্যকাল, যৌবনকাল, বৃদ্ধকাল এমনকি কবর জীবনেও যিনি রাহমাতুল্লিল আলামীনের সঙ্গলাভে ধন্য। সেই মহান ব্যক্তিত্বের বর্ণাঢ্য জীবনের প্রতিটি অধ্যায় মুসলিম মিল্লাতের অনুসরণীয় আদর্শ। বক্ষমান লিখনীতে তাঁর সাফল্য বিশাল জীবনীর গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি দিক আলোকপাত করার প্রয়াস পাব।

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে কেমন ছিলেন ঃ-

হযরত আবু বকর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে কখনো মুর্তি পূজা করেননি। মাত্র চার বছর বয়সে একদা তাকে তদীয় পিতা আবু কূহাফা মুর্তি ঘরে (মন্দির) নিয়ে গিয়ে বলল- এরা তোমার প্রভূ। তুমি এদের প্রনাম করো। (সূত্র - ইরশাদুস সারী শরহে বুখারী)

চার বছরের শিশু আবু বকর (রাঃ) মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করে মূর্তিদের একেবারে নিকটে গিয়ে বললেন যদি তোমরা খোদা (প্রভূ) হও তাহলে আমি তোমাদের কাছে কতিপয় আবেদন করছি। আমি খুবই ক্ষুদার্ত, আমাকে খাবার দাও। আমার কাপড় নেই, আমাকে কাপড় দাও। আবেদনের পর কোন জবাব কিংবা শব্দ না পেয়ে এবার আস্ত পাথর হাতে নিয়ে সম্বোধন করলেন, যদি সত্যি তোমরা খোদা হও তাহলে আমার আক্রমন থেকে তোমরা নিজেদেরকে রক্ষা করা। দেখা গেল এতেও কোন প্রতিক্রিয়া নেই। আর দেরি না করে ছুড়ে মারলেন সেই প্রস্তরখন্ড; মূর্তির নাক- মুখ ভেঙ্গে চৌচির। এদিকে বাবা-ছেলের এমন কান্ড দেকে যেন আকাশ থেকে ভেঙ্গে পড়ল। কাল বিলম্ব না করে সজোরে মেরে দিল এক থাপ্পড়। দ্রুত ছেলেকে স্ত্রীর কাছে নিয়ে গিয়ে এবং ঘটনা খুলে বলল। ঘটনা শুনে স্ত্রী রহস্যের দ্বার উম্মোচন করলেন। আর বললেন ওহে স্বামী! এই শিশুকে তার অবস্থায় ছেড়ে দাও। কোন ধরনের বাড়াবাড়ি কিংবা চাপ প্রয়োগ করা শুভ হবে না মনে হয়। এই শিশুর প্রসবকালীন সময়ের কথা বলছি। সেদিন আমি এক গায়েবী ওয়াজ শুনতে পেয়েছিলাম - হে আল্লাহর বান্দেনী তোমাকে দোযখের আগুনের শাস্তি হতে মুক্ত এবং সুসন্তানের শুভ সংবাদ দেয়া হচ্ছে। যার নাম আসমানে মধ্যে ছিদ্দিক; আর তিনি হবেন মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথী এবং বন্ধু। (সূত্রঃ- ইরশাদুস সারী ৬ষ্ঠ খন্ড ১৮৭ পৃষ্ঠা)।

পরবর্তীতে কোন এক সময় এসব ঘটনা স্বয়ং আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লা এর সামনে বর্ণনা করেছিলেন- হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, সেদিন সিদ্দিকে আকবার (রাঃ) তার কথা শেষ করার পর পরই হযরত জিবরাঈল (আঃ) নবীজির দরবারে হাজির হয়ে বললেন এতক্ষণ আবু বকর সিদ্দিক যা বলেছেন সত্যিই বলেছেন। (সূত্র ঃ- প্রাগুক্ত)

নবীজির একান্ত সঙ্গী ঃ

ইসলাম গ্রহণের পর প্রায় সারাক্ষণ নবীজির দরবারে পড়ে থাকতেন। কি যুদ্ধ, কি সফর সব কর্মসূচীতে সিদ্দিকে আকবর (রাঃ) এর অবস্থান থাকতো নবীজির সান্নিধ্যে। আর গোপনে মানুষের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌছাতে লাগলেন। তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় অল্প দিনেই প্রসিদ্ধ কিছু লোক ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আবদ্ধ হন। হযরত উসমান (রাঃ), হযরত যুবাইর ইবনে আওয়াম (রাঃ), হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ, হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, হযরত তালহা ইবনে ওবাইদুল্লাহ (রাঃ) প্রমুখ সাহাবী তারই দাওয়াতে ইসলামের পতাকা তলে সমবেত হন। (যুরকানী আলাল মাওয়াহেব ১ম খন্ড ২৪৬ পৃষ্টা)

ইসলাম প্রচারে প্রথম ওয়াজ মাহফিল ঃ-

মুসলামানদের সংখ্যা যখন ২৮ জন হয়ে গেল তখন সিদ্দিকে আকবর (রাঃ) নবীজির কদমে আবেদন জানালেন, হুজুর! এখনতো আমরা প্রকাশ্যে ইসলামের ঘোষণা দিতে পারি। সমাজ, রাজনীতি ও সমাজনীতিতে প্রাজ্ঞ প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিদ্দিকে আকবরকে আরো কৌশলী হওয়ার পরামর্শ দিয়ে বলেন, এখনো মুসলমানের সংখ্যা পর্যাপ্ত নয়। তাই ঝুঁকিপূর্ণ কাজে হাত দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবেনা। কিন্তু ইসলামের প্রতি প্রবল আগ্রহ অগাধ শ্রদ্ধা, গভীর ভালবাসার কারণে সিদ্দিকে আকবর একবার নয়, বারংবার অনুমতি চাওয়ার ফলে তিনি অনুমতি দিলেন। অনুমতি পেয়েই পতঙ্গের ন্যায় পবিত্র মসজিদে হারামের আঙ্গিনায় হাজির হয়ে শুরু করলেন মাহফিলের তাকরির। এটাই ইসলামের প্রচারের প্রথম সমাবেশ। যখনই সিদ্দিকে আকবর (রাঃ) লোকদেরকে আল্লাহ-রাসূলের প্রতি দাওয়াত দিলেন উপস্থিত কাফির মুশরিকরা চারদিকে হতে বৃষ্টির মত পাথর হামলা করতে লাগল। উপর্যপুরী হামলায় তাঁর শরীর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল। চেহারা রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেল। পরিশেষে তার গোত্রের কিছু লোক এগিয়ে এলে কাফির মুশরিকরা পালিয়ে যায়। উদ্ধারকারীরা একটি চাদরে আবৃত করে গুরুতর আহত অবস্থায় সিদ্দিকে আকবরকে ঘরে পৌছে দেন। এত বেশী আহত হয়েছিল - বনী তামিম গোত্রের লোকদের প্রবল ধারনা হয়েছিল যে, সিদ্দিকে আকবরের মৃত্যু নিশ্চিত। জর্জরিত শরীর নিয়ে কিছুক্ষণ পরপর বেহুশ হয়ে যাচ্ছিলেন। মা-বাবা আত্মীয়-স্বজনেরা অনেক চেষ্টা করেও কথা বলাতে পারলনা। অনেকক্ষন পর হঠাৎ হুশ ফিরে আসলে কোনমতে কথা বলার শক্তি পেলেন। এ সুযোগে আশে-পাশের লোকদের কাছে উপবিষ্ট লোকদের কাছে জানতে চাইলেন তোমরা আমাকে আগে বলো আমার প্রিয় নবীর কি অবস্থা? তিনি ভাল আছেন তো? অক্ষত আছেন তো? এমন কঠিন বিপদ এবং নাজুক মুহূর্তেও নবীজির কথা ভুলতে পারেননি। বনী তামীম গোত্রের লোকেরা তখনও ঈমান না আনার কারণে সিদ্দিকে আকবর (রাঃ) এর কথা গুলো পছন্দ হলোনা। তাই রাগ এবং অভিমান করে সবাই চলে গেলেও মা ছেলেকে ছেড়ে চলে যেতে পারে না। একমাত্র মা-ই সিদ্দিকে আকবরের পাশে বসে কাঁদছেন আর আদর করে জিজ্ঞাসা করছেন, বেটা! তুমি কী খাবে? কী দেব তোমাকে? কিন্তু সিদ্দিকে আকবরের একটিই আবেদন আম্মা! বরং তুমি আমাকে আমার নবীর খবরটা সংগ্রহ করে দাও। আমার জানতে বড় মন চাচ্ছে আমার প্রাণপ্রিয় নবীজি কেমন আছেন? উম্মে জামিল বিনতে খাত্তাব তার ঘরে এলে তার কাছ থেকে নিশ্চিতভাবে জানতে পারলেন যে, নবীজি সম্পূর্ণ সুস্থ এবং নিরাপদ আছেন। এবার বললেন আমি কসম করে বলছি আমি ততক্ষণ মুখে খাবার দিবনা যতক্ষণ না আমার নবীজিকে সামনে হাজির করাবেনা। তোমরা আমাকে নবীজির দরবারে নিয়ে চলো। পরিশেষে মা ছেলে আবু বকর সিদ্দিককে নিয়ে অনেক কষ্টে নবীজির দরবারে হাজির হলেন। এদিকে নবীজি স্বয়ং বন্ধু আবু বকরকে এক নজর দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষার প্রহর গুনছিলেন। ঠিক ঐ মুহূর্তে প্রাণপ্রিয় সাহাবীর উপস্থিতিতে নবীজি যেন হারানো মানিক ফিরে পেলেন। এগিয়ে এসে অতি মুহব্বতের আবেগ নিয়ে তাকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে কপালে উপুর্যপুরী চুম্বন দিতে লাগলেন। আর সিদ্দিকে আকবর (রাঃ) নবীজির দরবারে আরজ করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মা তাঁর ছেলের উপর দয়াবতী আপনার মোবারক দোয়া হলে আল্লাহ পাক তাকে জাহান্নামের স্থায়ী আগুন থেকে রক্ষা করবেন। সিদ্দিকে আকবরের (রাঃ) ফরিয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই দেখতে পেলেন তার আম্মাজান নবীজির উপর কালিমা শরীফ পড়ে ইসলামের পতাকাতলে শামিল হয়ে গেলেন এবং বেহেশতের ঠিকানা নিশ্চিত করে নিলেন। (হায়াতুস সাহাবা ২য় খন্ড ২৯০ পৃষ্ঠা)

সকল বিষয়ে প্রথম ঃ

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) ইসলাম গ্রহনের ক্ষেত্রেই প্রথম ছিলেন - এমনটি নয়; বরং ইসলামের দাওয়াত প্রচার, আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা, গোলাম আজাদ করা, ইবাদত বন্দেগী নবীজির খিদমতসহ প্রতিটি ভাল কাজে তিনি ছিলেন সবার অগ্রে। হযরত উম্মুল মুমিমীন আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) বলেন, আব্বাজান আবু কফর সিদ্দিক (রাঃ) নবীজির খেদমতে ৪০ হাজার (তৎকালিন) দেরহাম খরচ করেছিলেন। তিনি যেদিন ইন্তেকাল করেছিলেন সেদিন তাঁর কাছে কোন দিনারও ছিলনা কোন দেরহামও ছিলনা। (ফতহুল বারী ৭ম খন্ড ১১ পৃষ্ঠা)

তাবুক যুদ্ধের খরচের জন্য নবীজি সাহাবীদের কাছে চাঁদা সংগ্রহের ঘোষনা দিলেন সাহাবীরা স্ব-স্ব

সামর্থানুসারে উক্ত ডাকে সাড়া দিলেন। হযরত ফারুকে আজম ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেন, ভাগ্যিস আমার কাছে ঐদিন সকল প্রয়োজনীয় মুহুর্তেও চাইতো ও সম্পদের পরিমাণ বেশী ছিল। আবু বকর সিদ্দিকের পরিমাণ কোন কারণে অল্প ছিল। সুতরাং আজকে আমার মোক্ষম সুযোগ। আজ এমন ভাবে আল্লাহর রাস্তায় দান করবো যাতে হযরত সিদ্দিকে আকবরের উপর অগ্রগামী হয়ে যাবো। কারণ সব সময় তিনি প্রথম স্থানে থাকেন। কাল বিলম্ব না করে ঘরে গিয়ে সমস্ত সম্পদেকে দু'ভাগে ভাগ করে অর্ধেক রেখে দিলেন, বাকী অর্ধেক সম্পদের বিশাল বহর নিয়ে নবীজির কদমে এনে হাজির করে দিলেন। নবীজি জিজ্ঞাসা করলেন ওমর! ঘরে কি রেখে এসেছ? উত্তরে বললেন, হুজুর সমস্ত সম্পত্তির অর্ধেক নিয়ে এসেছি বাকিটা রেখে এসেছি। এদিকে সিদ্দিকে আকবরও ঘরে যা কিছু ছিল এমনকি চুলার ছাই পর্যন্ত সব কিছু একটা জুড়িতে করে নবীজির খেদমতে হাজির করলে নবীজি জিজ্ঞাসা করলেন আবু বকর তুমি কি নিয়ে এসেছ? উত্তরে বললেন হুজুর এবার তেমন কোন সম্পদ ছিলনা তাই পরিমাণটা কম হয়েছে। তবে ঘরে যা পেয়েছি সবই নিয়ে এসেছি আর পরিবার পরিজনের জন্য আল্লাহ এবং তার রাসূলকে রেখে এসেছি। উত্তর শুনে হযরত ওমর (রাঃ) সহ উপস্থিত সবার চোখ যেন কপালে ওঠে গেল। আর এক বাক্যে সবাই স্বীকার করে নিলেন ইসলামের খেদমতে হযরত সিদ্দিকে আকবরই সব বিষয়ে প্রথম। (মেশকাত শরীফ ৫৫৬ পৃষ্ঠা)

নবীর মহব্বতে জন্মভূমি ত্যাগ ঃ-

ইসলামের মহান ত্রাণকর্তা হযরত সিদ্দিকে আকবর (রাঃ) নবীর মুহব্বতে কেবল মাল সম্পদ ত্যাগ করেছেন এতেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং নিজের মাতৃভূমির মায়া আত্মীয় স্বজনের মায়া পর্যন্ত ত্যাগ করে এক যুগান্তকারী দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। মুসলমানদের উপর কুরাইশদের অত্যাচার জুলুমের মাত্রা বেড়ে গেলে কিছু কিছু মুসলমান সহ্য করতে না পেরে হাবশায় হিজরত করেন আবার কিছু কিছু মদীনা মনোয়ারায় চলে যান। তাই হাতে গোনা কয়েকজন মুসলমান ছাড়া আর কেউ ছিলনা। সুযোগ বুঝে কাফের মুশরিকরা নবীজির বিরুদ্ধে নতুন মাত্রা শুরু করল। এমনকি তাকে হত্যা করার মত দুঃসাহসিক নীল নকশাও তৈরী করা হলো। তাই একদিন হযরত জিবরাঈল (আঃ) মারফত আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নবীজিকে মদীনা শরীফ হিজরতের নির্দেশ প্রদান করেন। মহান আল্লাহর নির্দেশের কথা জানালে সিদ্দিকে আকবরও নবীজির সাথে হিজরতের আবেদন জানালে নবীজি বললেন ঠিক আছে তুমি প্রস্তুত থেকো। আমি যাওয়ার সময় তোমাকে ডেকে নেব।

হিজরতের জন্য অপেক্ষা ঃ

নবীজির সম্মতি পেয়ে সিদ্দিকে আকবর দিনের বেলাতো বটে, রাত্রের বেলায়ও এ অপেক্ষার প্রহর গুনতেন এমনকি বিছানায় শুয়ে ঘুমকে নিজের জন্য নিষিদ্ধ করে নিলেন। এভাবে দিন রাত পার করে দিয়েছিলেন আর কান পেতে অপেক্ষা করছেন কখন নবীজির নূরানী জবাব থেকে ডাক আসবে। এদিকে একরাত্রে কাফের মুশরিকরা নবীজির পবিত্র আস্তানার চতুর্দিকে ঘেরাও করে ফেললো। আর ঐ রাতে হিজরত করার জন্য আল্লাহ পাকের চূড়ান্ত নির্দেশ নিয়ে জিবরাঈল আমিন রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হলেন ঐ রাতে হযরত মাওলা আলী (রাঃ) নবীজির দরবারে ছিলেন। নবীজি তাকে বললেন- আলী তুমি আমার বিছানায় শুয়ে থেক, আর আমি মদীনায় হিজরত করলাম। বাহিরে শত্রুরা ওঁৎপেতে বসে রয়েছিল। কখন নবীজি ঘর থেকে বের হচ্ছেন। নবীজি ঘর থেকে বের হয়ে সূরা ইয়াছিনের কয়েকটি আয়াত তেলাওয়াত করে হাতের মুষ্টিতে ধুলো-বালি নিয়ে শত্রুদের দিকে ছুড়ে মারলেন এতে ধুলাকণাগুলো প্রত্যেকের চোখের ভিতরে গিয়ে পৌঁছে গেল তারা চোখ কঁচলাতে কঁচলাতে মাটিতে বসে পড়ল। নবীজি তাদের সামনে চলে গেলেন, তারা দেখতেই পেলনা। এভাবে নবীজি আবু বকরের বাড়ির আঙ্গিনায় গিয়ে ডাক দিলেন! হে আবু বকর! প্রথম ডাকেই সিদ্দিকে আকবর বলে দিলেন "লাব্বাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ"। নবীজি আমি হাজির,নবীজি প্রশ্ন করলেন এত গভীর রাতে তুমি কিভাবে সাড়া দিলে? উত্তরে সিদ্দিকে আকবর (রাঃ) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যে দিন আপনি আমাকে হিজরতের কথা বলেছিলেন সে দিন থেকে বিছানায় শুয়ে শুয়ে ঘুমানো বাদ দিয়ে দিয়েছি। সারারাত দরজার পাশে কান লাগিয়ে দিয়ে আপনার ডাকের অপেক্ষায় ছিলাম। কারণ,একবারের জায়গায় যদি কয়েকবার ডাকতে হয় তাহলে আপনার কষ্ট হবে। তা আমার জন্য

মঙ্গলজনক হবে না। এবার ছুটে চললেন দু'জনই মদীনা মনোয়ারার পানে। মক্কা মোকাররমার তিন মাইল দূরে সুর পর্বতের অত্যন্ত দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে গুহার নিকটবর্তী হলেন। নবীজি বললেন, আমরা গুহার অভ্যন্তরে অবস্থান নিই, যাতে শত্রু আমাদেরকে না দেখে। কারণ, দিনে তারা আমাদের পিছু নেবে নিশ্চয়।

সূর পর্বতের গুহায় অবস্থান এবং সিদ্দিকে আকবরের সর্বোচ্চ ত্যাগ ঃ

নবীজির পক্ষ হতে "গারে সূরে" অবস্থানের কথা শুনে হযরত সিদ্দিকে আকবর আরজ করলেন। নবীগো! আপনি একটু অপেক্ষা করুন। আমি গুহার অভ্যন্তরে গিয়ে দেখি এবং পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করি। গুহার ভিতরে গিয়ে দেখা গেল ছোট ছোট অনেক গর্ত যেন সব বিষাক্ত সাপ আর বিচ্ছুর বাসা। সিদ্দিকে আকবর নিজের গায়ের চাদর ছিড়ে প্রত্যেকটা গর্তের মুখ বন্ধ করে দিলেন কিন্তু কাপড়ের অভাবে আরেকটা গর্ত বন্ধ করা সম্ভব হলনা তাই ঐ গর্তের মুখে নিজের পা বসিয়ে দিলেন আর বললেন ইয়া রাসুলাল্লাহ! এবার প্রবেশ করুন। তারপর নবীজির গুহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন এবং সিদ্দিকে আকবরের কোলে মাথা মোবারক রেখে বিশ্রাম নিতে লাগলেন।(সূত্র- মিশকাত শরীফ -৫৫৬ পৃষ্ঠা)

নবীজি যখন বিশ্রাম নিচ্ছিলেন তখন এক বিষধর সাপ গুহার অভ্যন্তরে প্রতিটি গর্তের মুখ বন্ধ দেখে সর্বশেষ সিদ্দিকে আকবরের পা দিয়ে আটকানো গর্তের মুখে এসে প্রবেশের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে সিদ্দিকে আকবরের পায়ে দিল এক কামড়। প্রচন্ড ব্যাথা অনুভব করার পরও অত্যন্ত জোড়ালোভাবে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করলেন। কোন ধরনের নড়াচড়া করলেন না, যেন নবীজির ঘুম ভেঙ্গে না যায়। কিন্তু পাহাড়িয়া বিষধর সাপের বিষের প্রভাবে সমস্ত শরীর আস্তে আস্তে কালো হয়ে ওঠলো চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি বেরিয়ে এলো। এক ফোটা পানি রাসূলের চেহারার উপর গিয়ে পড়ল। (সূত্র - মিশকাত শরীফ -৫৫৬ পৃষ্ঠা)

নবীজি চোখ খুললেন আর সিদ্দিকে আকবরের এহেন নাজুক অবস্থা দর্শনে জিজ্ঞাসা করলেন হে আবু বকর! কী হয়েছে তোমার? উত্তরে বললেন, সাপ কামড় দিয়েছে। নবীজি বললেন চিন্তার কোন কারণ নেই। এক্ষুনি চিকিৎসা হয়ে যাবে। এই বলে মুখের থুথু মোবারক সিদ্দিকে আকবরের শরীরে লাগিয়ে দিতেই সমস্ত শরীরের বিষ মুহূর্তের মধ্যেই পানি হয়ে গেল। অবশেষে দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছে ইসলামের খেদমতে আত্মনিয়োগ করেন। হিজরতের পর দীর্ঘ দশ বছর নবীজির সাথে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অভিযান ও কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ সিদ্দিকে আকবরের জীবনের অন্যতম দিক।

খেলাফত লাভ ঃ

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকালের সময় সরাসরি খলীফা মনোনীত করে না গেলেও পূর্বেকার কতিপয় ঘটনা ও হাদীস শরীফে সিদ্দিকে আকবরের খেলাফতের ইঙ্গিত বহন করে। যেমন নবীজি অসুস্থ ছিলেন তখন মসজিদে নববীর ইমামতির দায়িত্ব সিদ্দিকে আকবরের উপর অর্পন করা হয়েছিল। তাছাড়া একদা কোন এক মহিলা রাসূলের দরবারে এসে কোন একটি বিষয়ে জানতে চাইলে নবীজি ঐ মহিলাকে পরবর্তীতে আসার নির্দেশ দেন। মহিলা আবেদন করল আগামীবার এসে যদি আপনাকে না পাই? উত্তওে হুজুর বললেন - আমাকে না পেলে আবু বকরের কাছে গিয়ে জেনে নিও"। (সূত্র ঃ- বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

ইন্তেকাল ঃ-

হিজরী ১৩ সনের জমাদিউল উখরা মাসে সিদ্দিকে আকবর (রাঃ) শারীরিক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি মাওলা আলী (রাঃ) কে ডেকে বললেন, আমার যখন ইন্তেকাল হয়ে যাবে তখন তোমার সেই হাত দিয়ে গোসল দিও যে হাত দিয়ে প্রিয় নবীকে গোসল দিয়েছ। অতঃপর সুগন্ধি লাগিয়ে লাশ কাফন পরিধান করে নবীজির রওজা পাকের সামনে নিয়ে রেখে দিও আর নবীজির দরবারে আবেদন করিও ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার বাল্যবন্ধু, যৌবনকালের বন্ধু এবং হিজরতের সাথী আজ আপনার কদমে হাজির। এতে যদি সাড়া পাওয়া যায় তাহলে আমাকে সেখানে দাফন করবে; অন্যাথায়, জান্নাতুল বাকীতে (কবরস্থানে) দাফন করে দিও। পরবর্তীতে সিদ্দিক আকবরের ইন্তেকালের পর নির্দেশমত হযরত আলী (রাঃ) লাশ মোবারক রসূলের রওজা পাকের সামনে হাজির করে উল্লেখিত আবেদন করার পর রওজা পাক থেকে স্পষ্ট আওয়াজ ভেসে আসল। "আদখিলুল হাবীবা ইলাল হাবীব"। অর্থাৎ তোমরা বন্ধুকে বন্ধুর সাথে মিলিয়ে দাও। কারণ, বন্ধুর জন্য বন্ধু অধির আগ্রহে অপেক্ষমান। (সূত্র - খাসাযেসুল কুবরা, কৃত ঃ ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ূতী)

ডঃ শেখ শাহজাদা আহমদ পেয়ারা বাগদাদী (রাঃ)-এর মূল শিক্ষাই ছিল নবী প্রেম...

- মোহাম্মদ আবুল হাশেম

সকল প্রশংসা রাব্বুল আলামিনের যিনি মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। অসংখ্য দরূদ ও সালাম নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি, যিনি সর্বকালের, সর্ব যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি দয়াল নবীজীর আদর্শে বিশ্বাসী সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়িন, তাবে-তাবেয়িন, ওলামায়ে মুতাকাদ্দেসীন, সলফে সালেহীন, গাউছ, কুতুব, অলি-আল্লাহদেরকে যারা যুগে যুগে সিরাতুল মোস্তাকিমের দিকে মানুষকে পরিচালিত করেছেন। হক্ব ও বাতিলের সংঘাত চিরন্তন রীতি। আদিকাল থেকে এ রীতি চলে আসছে, এখনো আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। হক্বপন্থীরা বরাবরই বিজয়ী হয়ে আসছে। কেননা আল্লাহপাক কালামে পাকে এরশাদ করেন- "ওয়ালা তাহেনু ওয়ালা তাহজানু, ওয়া আনতুমুল আলাওনা ইকুনতুম মুমেনুন।" অর্থাৎ তোমরা (মুসলমানরা) ভীত ও সন্ত্রস্ত হইও না। তোমরাই বিজয়ী হবে যদি তোমরা মুমিন হও। নবুয়তের সীলমোহর খাতেমুন নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তিরোধানের পর তাঁর এ দায়িত্ব পালন করছেন ওয়ারেছাতল আম্বিয়া হিসেবে অলি আওলিয়াগণ। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাগানের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন কুমিল্লা শাহপুর দরবার শরীফের পীর ও মুর্শিদ ডক্টর শেখ শাহজাদা আহমদ পেয়ারা বাগদাদী (রাঃ)। তিনি আমাদেরকে শোক-সাগরে ভাসিয়ে বিদায় নিয়ে গেছেন।

ডঃ শেখ শাহজাদা আহমদ পেয়ারা বাগদাদী (রাঃ) অর্থাৎ আমার বাগদাদী বাবার জীবন সমুদ্রের ন্যায় গভীর, আকাশের ন্যায় প্রসার। সুতরাং তাঁর জীবন সম্বন্ধে লেখার দুঃসাহস আমার নেই। কিছু সময় হুজুরের সান্নিধ্যে গোলাম হিসেবে থাকার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল তাঁর কিতাব ছাপার উসিলায়। গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী বাবার ওফাত দিবস ছিল। এই উপলক্ষে শাহপুর দরবারে বিশাল আয়োজনের মধ্য দিয়ে দু'দিনব্যাপী বাবার ওরশ মোবারক অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৩ ও ২৪ ফেব্রুয়ারী ২০১৭ হুজুরের ওরশ মোবারক অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। পবিত্র ওরশ শরীফকে উপলক্ষ করে আমার পীর ও মুর্শিদ ডঃ শেখ শাহজাদা আহমদ পেয়ার বাগদাদী (রাঃ)-এর উপর কর্মময় জীবনের যতসামান্য মুরিদানদের উদ্দেশ্যে লেখার প্রয়াস মাত্র।

কুমিল্লাস্থ, শাহপুর দরবার শরীফের পীর সাহেব আমার পীর ও মুর্শিদ ডঃ শেখ শাহজাদা আহমদ পেয়ারা বাগদাদী চেকোশ্লোভাকিয়ার একাডেমী অব সায়েন্স থেকে রেডিয়েশন বায়োলজিতে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেন এবং মৌমাছির স্পার্ম-এর উপর রেডিয়েশনে বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টি করেন। তিনি ইরাকের বসরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন এবং পরবর্তীতে হুজুর গাউছে পাকের দরবারের খাদেম হিসেবে প্রায় ১০ বছর বাগদাদ শরিফ ছিলেন।

ডঃ শেখ শাহজাদা আহমদ পেয়ারা মহান আধ্যত্মিক সাধক গাউছুজ্জামান হযরত মাওলানা আবদুছ ছোবহান আল-ক্বাদেরী (রাঃ)-এর পুত্র এবং সাইয়্যেদিনা হযরত শেখ মহিউদ্দিন আবদুল ক্বাদের জিলানী গাউছুল আযম (রাঃ)-এর দরবারের একজন খাদেম ছিলেন। এবং সেখান থেকে খেলাফত প্রাপ্ত হয়ে সত্যের অনুসন্ধানকারীদেরকে আল্লাহর রহমতে ক্বাদেরীয়া ত্বরিকায় বায়াত করান এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন স্থানে ক্বাদেরীয়া খানকা স্থাপন করে গেছেন।

আমার পীর ও মুর্শিদ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে দয়াল নবীজী নূর, পাক পাঞ্জাতন এবং পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রিসালতের ওপর বক্তব্য পেশ করেছেন। তিনি সৌদি আরব, ইরাক, ইরান, তুরস্ক, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, বুলগেরিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, ফ্রান্স, জার্মানী, গ্রীস, হাঙ্গেরী, রুমানিয়া কোরিয়া, সিঙ্গাপুর ও জাপানসহ বিভিন্ন দেশ ভ্রমন করেন।

১৯৮৮ সনে যুক্তরাজ্যের বার্মিহামে প্রথম অনুষ্ঠিত পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুষ্ঠানের আখেরী মোনাজাত পরিচালনা করেন। আধ্যাত্মিক নেতা হিসেবে ১৯৮০ সনে আমেরিকা সরকারের আমন্ত্রণে সে দেশ ভ্রমন করেন। এবং সুন্নিয়তের দাওয়াত দিয়ে গেছেন। হুজুরের নিকট বহু বিধর্মী মুসলমান হয়েছেন।

দয়াল নবীজীর মাধ্যম ব্যতিত সরাসরি কিছুই পাওয়া যায় না–না জান্নাত, না নেয়ামত, না খোদা। এটাই ছিল আমার বাগদাদী বাবার মূল কথা। তাই তিনি সদা-সর্বদা এই শিক্ষাই সবাইকে দিতেন।

"নবীগো তোমার ভালবাসায়-জান্নাত পাওয়া যায়
নবীগো তোমার ভালবাসায়-আল্লাহ পাওয়া যায়।"

জান্নাত প্রাপ্তি ও খোদা প্রাপ্তির জন্য রাসূল প্রেম পূর্বশর্ত ডঃ আমহদ পেয়ারা বাগদাদী (রাঃ)-এর কণ্ঠে বলিষ্ঠভাবে ধ্বনিত হয়েছে। এবং নবী নূরের স্লোগান নিয়ে বিশ্বময় প্রচার করেছেন। দয়াল নবীজী নূরের এই প্রেরণা নিয়ে ভক্ত এবং মুরিদানদের সবক দিয়েছেন। আমার মুর্শিদ কেবলা বাগদাদী হুজুর (রাঃ)-এর মূল শিক্ষাই ছিল নবী প্রেম-নবীর ইশ্‌ক ও নবীর মহব্বত। নবী ছিলেন "নূর" এর প্রমাণ দিয়েছিলেন তিনি আলোর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষনের মাধ্যমে। তিনি ছিলেন "আপাদমস্তক আশেকে রাসূল।" তাঁরই প্রমাণ মিলেছে তাঁর নামাযে জানাযার লক্ষ লক্ষ লোকের সমাবেশের মধ্য দিয়ে। শতায়ূ পাওয়া এক বৃদ্ধ লোক বলেছিলেন, বিগত একশত বছরের মধ্যে কুমিল্লা শহরে কোন মানুষের জানাযায় এত লোকের সমাগম হয়নি।

১৯৭৭ সনে হুজুর কেবলা মায়ের অনুরোধে বাগদাদ শরীফ হতে দেশে ফিরে আসলেন এবং শাহপুর দরবারের হাল ধরলেন। হুজুর কেবলা দেশে ফিরে আসার পর চাঁদপুর, কচুয়া রহিমা নগরসহ পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্মেলনকে উপলক্ষ করে সারা বাংলায় সুন্নীয়তের নতুন জোয়ার শুরু হল। বাবাজান কেবলা ঘোষণা করলেন– নবীজীর মূল হল নূর। বাতিল পন্থীরা এর প্রতিবাদ করল। সৃষ্টি হল নূর আর মাটির দ্বন্দ্ব। ডঃ বাগদাদী হুজুর (রাঃ) ঘোষণা দিলেন আযানের পূর্বে দরূদ শরীফ পড়া সুন্নত ও মোস্তাহাব–অপর পক্ষ বললো বিদাত ও হারাম। আমার পীর ও মুর্শিদ ডঃ শাহজাদা আহমদ পেয়ারা বাগদাদী (রাঃ)-এর পক্ষ সমর্থন করলেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত-এর মহাসচিব অধ্যক্ষ হাফেজ এম এ জলিল (রাঃ) সহ এদেশের হাজার হাজার খাঁটি সুন্নী আলেমরা। হুজুরের পক্ষ থেকে বিরোধিদের বাহাছের আমন্ত্রণ জানানো হল-কিন্তু শত্রু পক্ষ তাতে সাহস পায়নি এবং হাজির হননি। তখনকার সময়ের সকল সুন্নী আলেমগণ আমার হুজুর কেবলার পক্ষ সমর্থন করে সারাদেশে নূরের ওপর ওয়াজ-নসিয়ত এবং দলিলাদি পেশ করতে শুরু করলেন। যার ধারাবাহিকতা অদ্যাবধি চলছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে।

ডঃ শেখ শাহজাদা আহমদ পেয়ারা বাগদাদী (রাঃ) সারাটা জীবনই বাতিল পন্থীদের বিরুদ্ধে লড়াই করে নবীজীর শান-শওকত মুরিদ ও ভক্তদের মনে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। শুধু বাংলাদেশেই নয়, পৃথিবীর যে দেশে গেছেন সে দেশেই নবীজী যে নূর তার বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রমাণ করেছেন। তিনি এশকে রাসূল ও এলমে শরীয়ত এবং এলমে তাসাউফের একজন অনন্য দার্শনিক বক্তা হিসেবে তরিকত, হাকিকত ও মারেফাতের একজন দিক্‌পাল হিসেবে সুন্নীয়তের খেদমত করে গেছেন। ২০ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে সারা বাংলার পীর মাশায়েখ, আলেম-ওলামাদের মধ্যে বাবাজান কেবলা অতি প্রিয় এবং শ্রদ্ধাভাজন হয়েছিলেন যে, হুজুর-এর নাম শুনামাত্র সবাই সম্মান প্রদর্শন করে বলতেন এবং এখনো বলেন, বাগদাদী হুজুর ছিলেন সত্যিকারের রাসূল প্রেমিক। তিনি হুজুর পুর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর

www.sunnibarta.com

উপর ও নবীদের বিবাহ-এর উপর অনেক কিতাব লিখে গেছেন। "নূরে খোদা, নূরে রাসূল ইয়া রাসুলাল্লাহ, ক্বলব ও আত্মা" ইত্যাদি কিতাবাদি আমাদের মাঝে রেখে গেছেন। যা পাঠ করলে ঈমান তাজা হয়, দয়াল নবীজীর প্রেম দ্বারা অন্তর ভরে যায়। ডঃ শেখ শাহজাদা আহমদ পেয়ারা বাগদাদী (রাঃ) পাক পাঞ্জাতন-এর মহা প্রেমিক ছিলেন। তিনি পাক-পাঞ্জাতন-এর চার্ট মুদ্রণ করে সকল মুরিদান ও ভক্তবৃন্দকে ঘরে ঘরে রাখতে বলতেন। আরও বলতেন "আমাকে ভালবাসলে পাক-পাঞ্জাতন চার্ট ঘরে রাখবে।" চিরকালের জন্যে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের জন্য আমাদের ছেড়ে প্রস্থান করলেন মানব হৃদয় আকাশের একটি নক্ষত্র। এতিম করে গেছেন লক্ষ কোটি ভক্ত ও মুরিদানদেরকে। আমরা যারা বেঁচে আছি হুজুরকে মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারছিনা। মুরিদান ছাড়াও যারা একবার হুজুরের সান্নিধ্যে এসেছেন তিনিও কোনাদিন আমার হুজুরকে ভুলতে পারেননি।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রদর্শিত সাহবায়ে কেরামের অনুসৃত ইসলামের মূলধারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের প্রচার প্রসারে যারা বহুমুখী অবদান রেখে ধরাধামে অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম আমার পীর ও মুর্শিদ ডঃ শেখ শাহজাদা আহমদ পেয়রা বাগদাদী (রাঃ)। যিনি এদেশের সুন্নী মুসলমানদের ঈমান, আকিদা, বিশ্বাস, চিন্তা, চেতনা ও মুল্যবোধকে সদা জাগ্রত রাখতেন। ভক্ত ও মুরীদদের মাঝে রাসূল প্রেমের নিদর্শন স্থাপন করে গেছেন আমরণ। এ দেশের সুন্নী মুসলমানদেরকে, আল্লাহ রাসূলের প্রেমের পাগল বানিয়ে গেছেন। তাঁর রেখে যাওয়া নবী প্রেম ও প্রদর্শিত মতে আমরা যেন পরিচালিত হতে পারি- এ ফরিয়াদই আল্লাহ তায়ালার দরবারে জানাচ্ছি। আমিন!

ডঃ শেখ শাহজাদা আহমদ পেয়ারা বাগদাদী (রাঃ)-এর ইন্তেকালের পর তাঁরই সুযোগ্য পুত্র গোলাম মোহাম্মদ আব্দুল কাদের কাওকাব আল-কাদেরী দরবারের গদীনশীন পীর হিসেবে দরবার পরিচালনা করছেন। এবং তিনি ইতোমধ্যেই একজন শরিয়ত ও তরিকতের পীর হিসেবে দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করছেন। শাহপুর দরবার বর্তমান পীর সাহেবের নেতৃত্বে উত্তরোত্তর এগিয়ে চলছে এবং মুরিদান ও ভক্তবৃন্দের সংখ্যাও বাড়ছে। বর্তমান পীর সাহেবের একটি দূরদর্শিতার উল্লেখ করলে বুঝা যাবে যে তিনি অধ্যাত্মিকভাবেও যথেষ্ট এগিয়ে আছেন। আপনারা সবাই জানেন যে, গত ১২ নভেম্বর ২০১৬ ইং তারিখে ঢাকায় সুন্নী মহা-সম্মেলন হবার প্রোগ্রাম ফাইনাল করেছিলেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত। কিন্তু সরকারী নিষেধজ্ঞার কারণে তা বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমান হুজুর কেবলা আমাদের দরবারের একটা প্রোগ্রাম দিয়ে দিলেন। ঢাকা ইসলামিক ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে। এবং সেই প্রোগ্রাম আমরা স্বতঃস্ফূর্ততার সাথে চালিয়ে যাই। সেই প্রোগ্রামে প্রায় ৩০টা গাড়ী দরবারের তরফ থেকে ঢাকায় আসে এবং অনেক লোকের সমাগম হয়। সুতরাং এতে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি আধ্যাত্মিকতায় যথেষ্ট এগিয়ে গেছেন। ঢাকায় আসার জন্যে হুজুরের তরফ থেকে পূর্ব ঘোষণানুযায়ী শাহপুর দরবার শরীফের মুরিদানদের ১২ই নভেম্বরের মহা সম্মেলনে যোগদান সফল হয়েছে। বাংলাদেশের যত হক দরবার রয়েছে তার মধ্যে শাহপুর দরবার অন্যতম-আলা দরবার। যেই দরবার শরিয়তের পুংখাপুংখু নিয়মের মধ্যে চলে। ওরশ শরীফে মহিলাদের যাওয়া নিষেধ এবং কোন রকম শরিয়ত বিরোধী কাজ আমাদের দরবারে চলে না। বর্তমান ফেতনার যমানায়ও সহিভাবে দরবার চালিয়ে যাওয়া পীর সাহেবের দূরদর্শিতাই প্রকাশ পায়। সুতরাং আমাদের এই দরবার যেন কেয়ামত পর্যন্ত জারি থাকে এই কামনাই করছি।

বর্তমান পীর ও মুর্শিদ দরবারে হেফজখানা, এতিমখানা তার পাশাপাশি দাখিল মাদ্রাসা চালু করেছেন। যে মাদ্রাসা থেকে সুন্নি আলেম প্রোডাকশন হবে। সুন্নিয়তকে কায়েম রাখবে এসব ছাত্ররাই একদিন বড় আলেম হবে। সুতরাং হেফজখানা, এতিমখানা এবং দাখিল মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার ফলে দরবারের শান-মান আরো বৃদ্ধি পাবে।

www.sunnibarta.com

গাউসে পাকের জীবন ও কর্ম

শাহজাহান মোহাম্মদ ইসমাইল

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আবদুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি'র জন্ম ১ রমজান, ৪৭১ হিজরী, ওফাত ১১ রবিউস সানি, ৫৬১ হিজরী। হযরত গাউসুল আযম কেবল মাত্র একজন শীর্ষস্থানীয় সুফী সাধকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একাধারে আইনজ্ঞ, শাস্ত্রিবিদ, ধর্মবেত্তা, দার্শনিক, অসাধারণ বাগ্মী ও সুসাহিত্যিক। মুসলিম সূফীরা অনেক তরীকায় বিভক্ত ছিলেন। ইসলামী জ্ঞানকোষে এক শতেরও বেশী সূফী তরীকার একখানা তরীকা উদ্ভূত হয়েছিল। সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ তরীকাকগুলোর অন্যতম ও সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী তরীকা হল কাদেরিয়া তরিকা।এ তরিকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন প্রখ্যাত সূফী সাধক শায়খ মুহীউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বংশধর ছিলেন। গোটা দুনিয়ার মুসলিম সমাজ বিশেষতঃ ভারতের সুন্নী সম্প্রদায়ের সুফীগণ তাঁকে অতিশয় সম্মানের চোখে দেখে থাকেন। তিনি সাধারণতঃ 'গাউসুল আযম; নামে পরিচিত। দি স্পিরিট অব ইসলাম - সৈয়্যদ আমীর আলী। "লে কনফ্রেরীজ রিলিজিয়াসেতস মুসলমানস" প্রথম খন্ড গ্রন্থের রচয়িতার মতে, প্রাচ্যে কাদেরিয়া তরীকার ব্যাপক প্রভাব বিদ্যমান। জাভা ও চীন পর্যন্ত বিস্তৃত আর আনকা, মক্কা ও মদীনাতেও প্রতিষ্ঠিত। আত্মসংযম, তন্ময় মরমী ভাব, জাতি ধর্ম-মত নির্বিশেষে বিশ্বপ্রেম বিষয়ক নীতি সমূহের সর্বোচ্চ বিকাশ, অতিশয় দানশীলতা, সর্ববিধ কাজে ধর্মনিষ্ঠ, বিনয় এবং আত্মশক্তির কোমলতা তাঁকে ইসলামের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও সম্মানিত তাপসে পরিণত করেছে। ভারতীয় উপমহাদেশে তিনি 'বড়পীর' নামেই সর্বত্র সবিশেষ পরিচিত। বাংলাদেশে তাঁর নাম শোনেনি এমন লোক পাওয়া খুবই দুস্কর। তাঁর পবিত্র নামানুসারে প্রবর্তিত কাদেরিয়া তরীকা' শায়খ আবদুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হির জীবদ্দশাতেই বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠে। তাঁর ওফাতের পর তাঁর শিষ্য ও খলীফাদেও দ্বারা এ তরীকা সারা মুসলিম জাহানে বিস্তৃত হয়। বর্তমানে আরব, ইরাক, ইরান মধ্যপ্রাচ্য, তুরস্ক, মিশর ও উত্তর আফ্রিকার অন্যান্য মুসলিম দেশে এবং পাক-ভারত মুসলিম জাহানে বিস্তৃত হয়। বর্তমানে আরব, ইরাক, ইরান, মধ্যপ্রাচ্য, তুরস্ক, মিশর ও উত্তর আফ্রিকার অন্যান্য মুসলিম দেশে এবং পাক-ভারত বাংলাদেশ, বার্মায় কাদেরিয়া তরীকা অত্যন্ত জনপ্রিয়। অতি সাম্প্রতিকালে ইউরোপ, আমেরিকা ও কানাডাতেও এ তরীকা অতি দ্রুত বিস্তার লাভ করছে।

হযরত সায়্যিদুনা গাউসে পাক রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি'র মাতৃ ও পিতৃ বংশীয় শাজারা ঃ

১. হযরত বিবি ফাতেমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা
২. হযরত হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু
৩. হযরত আবদুল্লাহ মহজ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু
৪. হযরত মুসা আল জুন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু
৫. হযরত আব্দুল্লাহ্ সালেহ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু
৬. হযরত মুসা সানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু
৭. হযরত আবু বকর দাউদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু
৮. হযরত শামসুদ্দিন যাকারিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু
৯. হযরত ইয়াহয়া জাহিদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু
১০. হযরত আব্দুল্লাহ জীলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু
১১. হযরত আবু সালেহ মুসা জঙ্গী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি ও
১২. হযরত শায়খ আবদুল কাদের জীলানী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি
১৩. হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু
১৪. হযরত হোসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু
১৫. হযরত জয়নুল আবিদিন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু
১৬. হযরত ইমাম বাকির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু
১৭. হযরত ইমাম জাফর সাদিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু
১৮. হযরত ইমাম মুসা কাযিম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু
১৯. হযরত ইমাম আলী আর রিযা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু
২০. হযরত আবু আলাউদ্দিন মুহাম্মদ আল জাওয়াদে রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু
২১. হযরত কামাল উদ্দিন ঈসা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু
২২. হযরত আবুল আতা আবদুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু
২৩. হযরত মাহমুদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু
২৪. হযরত মুহাম্মদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু
২৫. হযরত আবু জামাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

amarboi.com

২৬. হযরত আবদুল্লাহ সওমাঈ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও

২৭. হযরত বিবি উম্মুল খায়ির ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু।

জন্ম ও বংশ পরিচিত

৪৭১ হিজরী সনের ১ রমজান ১০৭৭ খৃ. কাশপিয়ান সাগরের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত জীলান বা গীলান অঞ্চলের 'নীফ' নামক স্থানে বড়পীর হযরত শায়খ আবদুল কাদেও জীলানী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি জন্মগ্রহণ করেন। বস্তুত তাঁর সমগ্র জীবন ছিল মহান রাব্বুল আলামীনের অসীম কুদরতের প্রকাশস্থল। তাই শুভ জন্মের প্রথম প্রহর থেকেই এ সদ্যোজাত শিশুটিকে টানা একমাস রোযা রাখতে দেখা যায়। মাতৃগর্ভ থেকেই তিনি ছিলেন ১৮ পারা কুরআনের হাফেজ। হযরত সায়্যিদুনা গাউসে পাক রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি মাতৃ ও পিতৃ বংশীয় দু'টি ধারাই নুরনবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর নূরানী বংশধারার সাথে সংযুক্ত। মায়ের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বংশধর। তাই এক অতি পবিত্র শোণিত ধারার উত্তরাধিকার নিয়েই জন্মেছিলেন হযরত সায়্যিদুনা গাউসে পাক রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি। তাঁর পূন্যবতী মায়ের নাম ছিল হযরত বিবি উম্মুল খায়ের ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। তার নানাজান হযরত আবদুল্লাহ সওমাঈ রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি ছিলেন সেকালের একজন বিশিষ্ট অলী। তাঁর মহান পিতা হযরত আবু সালেহ মুসা জঙ্গী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি ছিলেন একজন অতি উচুস্তরের অলী।

প্রাথমিক শিক্ষা

নিতান্তই বালক বয়সেই এতিম হয়ে পিতার স্নেহ ছায়া থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। ঠাঁই হলো তাঁর বয়োবৃদ্ধ নানার সংসারে। আর বুযুর্গ নানার প্রত্যক্ষ তদারকীতে গ্রামের পাঠশালাতেই প্রাথমিক শিক্ষার পর্ব শুরু হয়। প্রথম যেদিন তিনি মক্তবে যান সেদিন সেখানে ছিল শিক্ষার্থীদের প্রচন্ড ভিড়। তখন মক্তবের ছাত্ররা,'আল্লাহর অলীর জন্য বসার জায়গা করে দাও' এ গায়েবী আওয়াজ শুনতে পায়। তখন উপস্থিত ছাত্ররা তার বসার জন্য জায়গা ছেড়ে দেয়। মক্তবের ওস্তাদজী যখন তাঁকে বিসমিল্লাহর সবক দিলেন তখনই ঘটে গেল এক অবাক কান্ড। ওস্তাদজীকে একাধারে তিনি বিসমিল্লাহ থেকে শুরু করে আঠার পারা পর্যন্ত মুখস্থ শুনিয়ে দিয়ে থেমে গেলেন, বিস্ময়ে হতবাক ওস্তাদজী তখন তাকে জিজ্ঞেস করলেন, বাচা, এগুলো তুমি কোথা থেকে শিখেছ? তিনি উত্তরে যা বললেন, তাতো আরা বিস্ময়কর! তিনি বললেন, 'হুযুর আমি মায়ের পেটে থাকতে আমার মা প্রতিদিন কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতেন। আমি আমার মায়ের কুরআন শরীফ তিলাওয়াত শুনে শুনে তা মুখস্থ করে নিয়েছি। এভাবে একদিনে শেষ তাঁর মক্তবে পড়াশোনার পাঠ। এবার তিনি উচ্চ শিক্ষার্থে ছুটলেন রাজধানী বাগদাদ নগরীরর দিকে।

উচ্চ শিক্ষার্থে বাগদাদ গমন

৫৮৮ হিজরীতে তিনি যখন অষ্টাদশ বর্ষীয় যুবক, তখন জিলান হতে উচ্চ শিক্ষার্থে মুসলিম বিশ্বের রাজধানী বাগদাদে গমন করেন। পথিমধ্যে ডাকাত দল কর্তৃক আক্রমণ হওয়া এবং তার অসাধারণ সত্যবাদীতা ও মাতৃভক্তির পরাকাষ্ঠায় মুগ্ধ হয়ে সদলবলে দস্যুবৃত্তি ত্যাগের ঘটনাতো বিশ্বখ্যাত।

শুরু হলো জ্ঞান সাধনা

জ্ঞান পিপাসা মিটাতে বাগদাদের সুবিখ্যাত জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিদের সাহচর্যে এসে তিনি শুরু করলেন জ্ঞান সাধনা। প্রথমেই শায়খ হাফেজ আবূ বালেত বিন ইউসুফের তত্ত্বাবধানে তিনি পবিত্র কুরআন শরীফ ভালভাবে হিফজ করে নিলেন। বহু খ্যাতনামা শিক্ষকের সান্নিধ্যে তিনি জ্ঞান বিজ্ঞানের তেরটি শাখায় অসাধারণ পান্ডিত্য অর্জন করেন। এলমে কেরাত, তাফসীর, হাদীস, আকাঈদ, এলমে কালাম, এলমে আনসাব (বংশ বিদ্যা), ইলমে লুগাত (অভিধান শাস্ত্র), আদব (সাহিত্য), এলমে আরূদ্বে (ছন্দ বিদ্যা), এলমে নাহু (ব্যাকরণ শাস্ত্র), ইলমে মুনাজিরা (তর্কবিদ্যা), প্রভৃতি বিষয়ে তিনি সুগভীর বিদ্যা অর্জন করেছিলেন। হাম্বলী মাযহাবের তিনি ছিলেন একজন শীর্ষস্থানীয় পন্ডিত। এভাবে কেটে গেল একে একে তাঁর নয়টি বছর। শেষ হলো জ্ঞান সাধনা। পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে সমান্তরাল গতিতে চলতে লাগলো তার আধ্যাত্মিক সাধনা।

তরীকতের দীক্ষা গ্রহণ

তরীকতের পথ খুবই বন্ধুর ও সমস্যা সংকুল। প্রতি পদে পদে এতে রয়েছে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। আরো আছে চিরশত্রু শয়তানের পাতা ফাঁদে পড়ে ঈমানচ্যুত হয়ে পথভ্রষ্ট হবার আশংকা। তাই একাকী এপথে চলা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আর এটা সমীচিনও নয়।

ডাক্তারী শাস্ত্র আয়ত্ব করার জন্য যেমন কেবলমাত্র পুঁথিগত বিদ্যা লাভই যথেষ্ট নয় বরং একজন বিজ্ঞ চিকিৎসকের অধীনে থেকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করাও অত্যাবশ্যকীয়। একজন শিক্ষাগুরুর পথ নির্দেশও তাই এ পথে চলার জন্য একান্ত অপরিহার্য। বাগদাদ নগরীর মুজাফফরিয়া মহল্লায় বাস করেন শায়খ হাম্মাদ বিন মুসলিম দাব্বাস রাহমাতুল্লাহি আলায়হি। সহজ সরল অনাড়ম্বর তার জীবন যাত্রা। আঙ্গুর ও খেজুরের রস বিক্রি করা তার পেশা। তাই মানুষ তাকে দাব্বাস বলে ডাকে। দাব্বাস শব্দের অর্থ রস বিক্রেতা। এই মহান বুজুর্গের রসে কোন দিনই মাছি বসেনা। সামান্য কীটপতঙ্গও বোঝে আল্লাহর ওলীর মর্যাদা। বোঝে না শুধু এক শ্রেণীর মানুষ। সিরিয়ার রাহবা গ্রামে জন্ম নিয়েছিলেন তিনি।

বাগদাদে আসার পর আর কখনও ফিরে যাননি স্বীয় জন্মভূমিতে এ মহান দরবেশ। বেছে নিয়েছেন খোদা অন্বেষণকারীদের সঠিক পথে পরিচালিত করার মহান দায়িত্ব। বর্তমান সময়ের অধিকাংশ পীর বুজুর্গ তারই শাগরিদ। যুগের কর্ণধার এ মহান সাধকের নিকটই তরীক্বতের প্রাথমিক দীক্ষা নিলেন তরুণ আবদুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি। আত্মনিয়োগ করলেন কঠিন আধ্যাত্মিক সাধনায়। প্রথম দর্শনেই নবাগত সদস্যের অতি উজ্জ্বল ভবিষ্যত বিষয়ে জানতে পারলেন শায়খ হাম্মাদ বিন মুসলিম দাব্বাস রাহমাতুল্লাহি আলায়হি। আল্লাহর অশেষ রহমতের চির জ্যোর্তিময় বলয় সদা পরিবেষ্টন করে আছে তার এ নতুন শিষ্যকে। সময় তার জন্য অপেক্ষমান। সে সময় সন্নিকটে যখন এ অনারব অভিসিক্ত হবেন সমস্ত গাউসদের ইমাম বা 'গাইসুল আযম' রূপে। একদিন তামাম শিষ্যদের ভরা মজলিসে তিনি বলেই ফেললেন সে কথা। তিনি বলেন, "এই কদম সকল ওলীর স্কন্ধে।" তাঁর এই ঘোষণার সময় তখনকার সমস্ত ওলী তার কদমের উদ্দেশ্যে নিজেদের ঘাড় নত করে দেবেন। মহান সাধক শায়খ হাম্মাদ বিন মুসলিম দাব্বাস রাহমাতুল্লাহি আলায়হি-এর সান্নিধ্যে দীর্ঘদিন কাটিয়ে সাধনা পথের সুকঠিন ও বিপদসংকুল বাঁকগুলো একে একে পার হয়ে গেলেন তিনি। কঠিন রিয়াজত ও মুশাহাদার মাধ্যমে তরীক্বতের সঠিক পথ পাড়ি দেবার মত শক্তি সাহস সঞ্চার হলো তার নিজের মধ্যে। এবার শুধুই এগিয়ে চলার পালা। যে বাজ পাখী দূর আকাশে উড়ে বেড়াবার জন্যই জন্ম নিয়েছে তাকে কী করে খাঁচায় আটকাবেন শায়খ হাম্মাদ? কিন্তু তিনি যে তাকে নির্বিঘ্নে নিঃসীম নীলকাশের রাজত্ব করার মত একটা ভিত তৈরি করে দিতে পেরেছেন সেটাই বা কম কী? আল্লাহ্‌র প্রেম ও মারিফাতের প্রচন্ড নেশায় পেয়ে বসেছে তরুণ আবদুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলায়হিকে। দয়াময় রবের মিলন সুধা আকণ্ঠ পান না করে যেন কিছুতেই নিস্তার নেই তার। তাকে মুরীদ করে নিলেন এ মহান সাধক। তার মনের আশা পূরণের পথও বাতলে দিলেন তিনি। এভাবে দিন-রাত কঠোর রিয়াজত মুশাহিদা-মুজাহিদার মধ্য দিয়ে কেটে গেল তার পঁচিশটি বছর। সার্থক হলো তার রিয়াজত, আর পরিপূর্ণতা পেলো তার কঠোর সাধনা।

আওলাদে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মর্যাদা

(সুন্নীবার্তা ডেস্ক)

শুরুতে পরম করুনাময় রাব্বুল আলামীনের পবিত্র দরবারে অসংখ্য শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি, দরুদ সালামের নযরানা নিবেদন করছি রাহমাতুল্লীল আলামীন হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এর চরণ মোবারকে। শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি, বাগে রেসালতের সুরভিত পুস্পরাজি তাঁর (দঃ) পুতঃপবিত্র সাহাবায়ে কেরাম ও আওলাদে রাসূলদেরকে, যাদেও অক্লান্ত পরিশ্রম ও ত্যাগের বিনিময়ে ইসলামের সু-বিশাল ইমারত বিনির্মিত।

রাসূলে পাক (দঃ) এরশাদ করেন, "কিয়ামতের দিন প্রত্যেক বংশের মর্যাদা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে কিন্তু আমার বংশ মর্যাদা ছিন্ন হবে না। গভীরভাবে চিন্তা করলে একটি বিষয় সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে আর তা হল, পৃথিবীতে লকব প্রাপ্ত বা কোন ভূষণে ভূষিত অনেক ব্যক্তিবর্গ রয়েছে,কিন্তু তা যে ব্যক্তি ভুষিত হয়েছে তার জন্য কিন্তু তা পরবর্তী বংশের জন্য নয়" কিন্তু পবিত্র কোরআন ও হাদীস শরীফ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় একটি মাত্র বংশের জন্য স্থায়ী মর্যাদা ও সম্মান রয়েছে, তা হলো সৈয়্যদ বংশীয় লোক তথা আওলাদে রাসূল (দঃ)। আওলাদে রাসূল (দঃ)'র প্রকৃত পরিচয় পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফের আলোকে সাম্যক রুপে জানা প্রত্যেকের প্রয়োজন। কেননা একটা প্রবাদ বাক্য রয়েছে যে,

"চিনতে ভুল হলে, তাজিমেতে ভুল হয়।"

কারণ আওলাদে রাসূলের প্রতি কুরআন ও হাদীসের গৌরবউজ্জল, ভালবাসা, সম্মান, মর্যাদা, এবং শ্রদ্ধা প্রদর্শনের প্রকৃত রুপটি অনেকের কাছে অনুপস্থিত। তাই তাঁদের যথার্থ পরিচয় লাভ করাই আমাদের এ প্রয়াস।

আমরা জানি যে, আকাশ দুই প্রকার যথাঃ-

১। জ্যোৎস্না রাতের আকাশ।

২। সত্য ও ন্যায়ের আকাশ।

জ্যোৎস্না রাতের আকাশের নক্ষত্ররাজি শোভাবর্ধন করে। অপরদিকে মানবতা, সত্য ও ন্যায়ের আকাশে আওলাদে রাসূলগণ যুগে যুগে উদিত হয়ে বিকল্প রুপ ধারণ করে নক্ষত্র ও তারকারাজিকেও হার মানিয়েছেন। তাঁদের প্রকৃত পদ মর্যাদা, ভক্তি, ভালবাসা ও শ্রদ্ধা নিবেদনের চিত্র অংকন করা আমরা এবং এ বিশাল জগতের কোনো গুণী জ্ঞানীর পক্ষে সম্ভব নয়। তারপরও আমরা বর্তমান সমাজের বাস্তবতার নিরিখে সত্য, সন্ধানীর জ্ঞাতার্থে পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফের আলোকে বিবৃত করে আমি অধমের প্রতি আওলাদে রাসূলগণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ রুহানী দয়ার নযরের প্রত্যাশায়, আর যখনই আল্লাহর রাসূল (দঃ) এ কাজে তুষ্ঠ হয়ে তাঁর সাহায্যের হস্ত মোবারক সম্প্রসারিত করবেন।

রাব্বুল আলামীন তাঁর রুবুব্বীয়্যতের ভাষায় কুরআন কারীমে ঘোষণা করেন-

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (৩৩).

অর্থাৎ হে আহলে বায়ত! নিশ্চয় আল্লাহ পাক চান, তোমাদের থেকে যাবতীয় অপবিত্র দূর করতে এবং আরো চান তোমাদেরকে সম্পূর্ণরুপে পবিত্র করতে।

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ পাক "আহলে বায়ত বলতে" কাদেরকে বুঝিয়েছেন?

এ প্রশ্নের জবাবে বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) এবং তাবেঈ হযরত মুজাহিদ, হযরত কাতাদাহ সহ অন্য মুফাসসিরগণ বলেন যে, "আহলে বায়ত বলতে", "আলে আবা" (চাদরাবৃত) কে বুঝানো হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো "চাদরাবৃত কারা?" তার বর্ণনা সহীহ মুসলিম শরীফে, এভাবে এসেছে, উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম (দঃ) একদিন প্রত্যুষে বের হলেন, তখন তাঁর শরীর মোবারক কালো নকশা বিশিষ্ট চাদর দ্বারা আবৃত ছিল।"অতঃপর হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) একদিন প্রত্যুষে বের হলেন, তখন তার শরীর মোবারকে কালো নকশা বিশিষ্ট চাদর দ্বারা আবৃত ছিল। "অতঃপর হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) আসলে নবীজি তাকে চাদরের মধ্যে শামিল করে নিলেন, এরপর হযরত ইমাম হোছাইন (রাঃ) আসলে তাকেও নবীজি (দঃ) চাদর মোবারকে জড়িয়ে নিলেন, অতঃপর আসলেন খাতুনে জান্নাত হযরতে মা ফাতেমাতুজ জোহরা (রাঃ) আল্লাহর রাসূল

(দঃ) তাকেও চাদর মোবারকের ভিতরে শামিল করে নিলেন। সর্বশেষ এলেন শেরে খোদা হযরত আলী (রাঃ) নবী তাঁকেও চাদরের মধ্যে শামিল করে নেন।

অতঃপর রাব্বুল আলামীনের দরবারে এই ফরিয়াদ জানালেন

اَللّٰهُمَّ هٰؤُلَاءِ اَهْلُ بَيْتِي اَللّٰهُمَّ اَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا)

অর্থাৎ ঃ হে আল্লাহ! এরাই আমার আহলে বায়ত এবং বংশীয় ও ঘনিষ্ঠ আপনজন, আপনি এদের থেকে অপবিত্রতা দূরীভূত করুন আর এদেরকে পরিপূর্ণভাবে পবিত্র করুন!

আওলাদে রাসূলের মর্যাদা ও সম্মান দাবী আকারে জোর করে আল্লাহর দরবার হতে কেহ আদায় করে নিয়েছেন এমন নয়। তাদের ত্যাগ আন্তরিকতা কোরবানী, নিষ্ঠাপূর্ণ ধর্মের আচার অনুষ্ঠান করেছেন। এমন মর্যাদা ও ভক্তি সম্মানকে যথার্থ মূল্যায়ন ও রুপ দান করেছেন স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। আল্লাহ প্রদত্ত তাদের ভক্তি শ্রদ্ধা ভালোবাসার মধ্যে নিহিত রয়েছে সাধারণ মুসলমানদের নাজাত ও মুক্তি। কিন্তু এর বিপরীতে রয়েছে কুফরী ও জাহান্নাম। কোরআন হাদীস পর্যালোচনা করলে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়।

মধ্যবর্তী অবস্থান সুদৃঢ় করানার্থে নবী করীম (দঃ) এর বাণী দ্বারা এটা স্পষ্ঠভাবে প্রতিয়মান হয় যে, এ চারজনের প্রতি নবীজির কতটুকু ভালবাসা ছিল। নিম্নে কয়েকটি হাদিস দ্বারা সহজেই অনুমান করা যাবে।

عن ابى هريرة قال نظر النبى صلى الله عليه وسلم الى على والحسن والحسين والفاطمة فقال انا حرب لمن حاربكم سلم لمن سالمكم -

অর্থাৎ, হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করিম (দঃ) হযরত আলী, ফাতেমা, হাসান ও হোসাইন (রাঃ) এর প্রতি নজর দিলেন এবং এরশাদ করেন আমি যুদ্ধ ঘোষণা করব যে ব্যক্তি তোমাদের সাথে যুদ্ধ করবে। আমি তার সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখব যে তোমাদের সাথে ভাল সম্পর্ক রাখবে।

রাসূল (দঃ) হতে জিজ্ঞেস করা হল, হে রাসূল (দঃ) আপনি আহলে বায়াত হতে কাকে অতি ভালবাসেন? তিনি উত্তর দিলেন হযরত হাসান ও হোসাইন (রাঃ)। যেমন বর্ণিত আছে যে,

انه سمع بن مالك يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اى اهل بيتك احب اليك قال الحسن والحسين -

অর্থাৎ ঃ- তিনি আনাস বিন মালেক হতে শ্রবণ করেছেন তিনি বলেন, নবী (দঃ) কাছে জিজ্ঞেসা করা হল আহলে বায়াতের মধ্যে কে অধিক আপনার কাছে প্রিয়। জবাবে তিনি এরশাদ করেন, হাসান এবং হোসাইন।

এরপর বর্ণিত হচ্ছে যে, হোসাইনের বন্ধুত্ব নবীজীর বন্ধুত্বেরই বহিঃপ্রকাশ, আর হোসাইনের সাথে শত্রুতাই নবীজীর সাথে শত্রুতারই বহিঃপ্রকাশ।

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احبهما فقد احبنى ومن ابغضهما فقد ابغضنى يعنى حسنا وحسينا – ومن احب الحسن والحسين فقد احبنى ومن يعضبهما اغضبنى -

অর্থাৎ ঃ- আল্লাহর রাসূল (দঃ) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি উভয়কে ভালবাসল সে আমাকে ভালবাসল। আর যে ব্যক্তি উভয়ের সাথে শত্রুতা পোষণ করল সে আমারই সাথে শত্রুতা পোষণ করল।

অর্থাৎ ঃ- যে ব্যক্তি হাসান ও হোসাইনের সাথে ভালবাসা পোষণ করবে আমিও তাকে ভালবাসব। যে ব্যক্তি উভয়ের সাথে শত্রুতা পোষণ করবে আমি ও তার সাথে শত্রুতা পোষণ করব।

হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ) এর কাছে যখন তার ভাতিজা হযরত রবি ইবনে উমাইর (রাঃ) প্রশ্ন করলেন যে, নবী করীম (দঃ) সবচেয়ে অধিক কাকে ভালবাসতেন। তিনি উত্তর দিলেন হযরতে ফাতেমা (রাঃ) কে! অতঃপর জিজ্ঞেস করলেন পুরুষ হতে কে? তিনি উত্তর দিলেন তার (ফাতেমার) স্বামী হযরত আলী (রাঃ) কে।

অপর একটি রেওয়াতে বর্ণিত আছে যে, হযরত রাসূল (দঃ) হতে জিজ্ঞাসা করা গেল আপনি সবচেয়ে অধিক কাকে ভালবাসেন? তিনি উত্তর দিলেন -

فاطمة احب التى منك وانت اعز التى منها قاله لعلى -

অর্থাৎ : হযরত ফাতেমা (রাঃ) অধিক পছন্দনীয় আমার কাছে তোমার চেয়ে। আর তুমি আমার নিকট তার হতে অধিক সম্মানী। এটা হযরত আলী (রাঃ) এর উদ্দেশ্যে বললেন। এক সময় কোন এক ব্যক্তি হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এর নূরানী দরবারে একটি রেশমী কাপড় হাদিয়া দিলেন। তিনি তা হযতর আলী (রাঃ) কে দিয়ে দিলেন।

www.sunnipara.com

একদিন হযরত আলী (রাঃ) উক্ত চাদর পাধিান করে নবীজির দরবারে হাজির হলেন। ইমামুল আম্বিয়া হযরত আলী (রাঃ) কে দেখা মাত্র নবীজির চেহারা মোবারক একটু মলিন হয়ে গেল। অবস্থা বুঝে হযরত আলী (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ) আমি রেশমী চাদর কি করব?

আওলাদে রাসূল (দঃ) এর কী শান দেখুন! তখন নবী করীম (দঃ) এরশাদ করেন, তুমি এটাকে টুকরা টুকরা করে ফাতেমা নামের মহিলাদের মধ্যে বন্টন করে দাও। একে নবীর কন্যার নামকে ও ভালবাসতেন। রাসূলে করিম (দঃ) এটা বলতে চেয়েছেন যে, আমার কন্যার নামের সাথে সংগতি রেখে যার নাম তাদেরকে ও সম্মান কর, এবং রেশমী কাপড় পরিধান করাও।

আওলাদে রাসূল (দঃ) এর সীমাহীন মর্যাদার কারণে স্বয়ং ফেরেশতাকূল পর্যন্ত তা মানতে স্বীকৃতি দিয়েছেন। কারন প্রতিদিনের মত রাসূল (দঃ) এর পবিত্র রওজা শরীফ জিয়ারত করার জন্য মহান আল্লাহ পাক সকালে ৭০০০০ ফেরেস্তা এবং গহ্যায় ৭০০০০ ফেরেস্তাকূল প্রেরেণ করেন, কিন্তু হঠাৎ একদিন ফেরেস্তাকুল নবীজীর (দঃ) রওজা মোবারক জিয়ারত করার পরে তন্মধ্যে একটি ফেরেস্তা মনে মনে চিন্তা করলেন যে, কেন আল্লাহ পাক শুধু শুধু এই রাসূল (দঃ) এর জিয়ারত করার জন্য আমাদেরকে প্রেরেণ করেন? তখন সাথে সাথে ওই ফেরেস্তার ডানা দুইটি ভেঙ্গে জমিনে পড়ে গেল। তখন ওই ফেরেস্তা আর আকাশে উড়তে পারতেছে না। তখন সেই ফেরেস্তা সেখানেই অর্থাৎ পাহাড়ের পাদ দেশে পড়ে রইলেন এবং চিৎকার করে করে কান্না করতেছেন।

ওই রাস্তা দিয়ে হযরত জিব্রাঈল (আঃ) যাচ্ছেন প্রিয় নবীজী (দঃ) এর রওজা মোরক জিয়ারত করার জন্য। হঠাৎ জিব্রাঈল (আঃ) ঐ ফেরেস্তার কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলেন তখন তিনি সাথে সাথে ঐ ফেরেস্তার নিকট গিয়ে তার কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তখন ঐ ফেরেস্তা বলেন, আমি রাসূল (দঃ) এর দরুদ শরীফ নিয়ে কটুক্তি করেছি বিধায় আজ আমার এই করুণ অবস্থা। তখন ঐ ফেরেস্তা বলেন, আপনি আমার জন্য প্রিয় নবীর (দঃ) একটু সুপারিশ করবেন। তখন হযরত জিব্রাঈল (আঃ) বলেন, আমার কোন সাধ্য নেই তোমার জন্য রাসূল (দঃ) এর দরবারে সুপারিশ করা। তখন জিব্রাঈল (আঃ) চলে গেলেন। রাসূল (দঃ) বলেন, ওহে জিব্রাঈল তুমি কি আসার পথে কোন বিপদগ্রস্থ ফেরেস্তাকে দেখেছ? তখন জিব্রাঈল (আঃ) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ) হ্যাঁ, আমি দেখেছি। তখন রাসূল (দঃ) বলেন, যাও ঐ ফেরেস্তাকে আমার আওলাদ হযরত ইমাম হাসান এবং হোসাইনের নিকট নিয়ে যাও, তারা তাকে নিয়ে খেলা করলে ঐ ফেরেস্তার ডানা দুইটি ভাল হয়ে যাবে এবং সেই আগের মত উড়তে পারবে। উপরোল্লিখিত ঘটনা থেকে প্রতিয়মান হয় যে, আওলাদে রাসুল (দঃ) এর মর্যাদা অনেক যা বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

নারায়ে তাকবীর
নারায়ে রিসালাত

আল্লাহু আকবার
ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)

খানকা-এ-জলিলিয়া

"মা নীড়" ১৩২/৩ আহমদবাগ, রোড নং-২, সবুজবাগ, ঢাকা- ১২১৪
ফোনঃ ৭২৭৫১০৭, ০১৭২-০৯০৬৯৯৬

খানকা-এ-জলিলিয়ায় প্রতি ইংরেজী মাসের ২য় বৃহস্পতিবার বাদ মাগরিব হালকায়ে যিকির ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সকল পীরভাই, হুজুরের ভক্তবৃন্দ ও অনুসারী খানকায় উপস্থিত হয়ে এবাদত-বন্দেগী ও হুজুরের রূহানী ফয়েজ লাভ করে আখেরাতের অশেষ নেকী হাসিল করুন।

সালামান্তে

মোহাম্মদ আবদুর রব ও হুজুরের ভক্তবৃন্দ

অধ্যক্ষ হাফেজ এম. এ জলিল (রঃ) ছিলেন আমাদের হকপথের দিশারী

– মোহাম্মদ আবুল হাশেম

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'য়ালার যিনি অজ্ঞানান্ধ মানুষের হেদায়তের জন্যে নবী-রাসূলদের প্রেরণ করেছেন। দয়াল নবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবী-রাসূলদের মধ্যে সর্বশেষ। এরপর পৃথিবীতে আর কোন নবী ও রাসূলের আবির্ভাব হবে না। তিনি খাতেমুন নবী। দয়াল নবীজীর উম্মতদের মধ্যে আওলিয়ায়ে কেরাম এবং আলেম ওলামাগণ কেয়ামত পর্যন্ত মানুষকে হেদায়েত করতে থাকবেন। হুজুর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমায়েছেন, আমার উম্মতের মধ্যে আওলিয়া ও ওলামাদের মর্যাদা বনী-ইসরাইলী নবীদের মর্যাদার মত। আওলিয়ায়ে কেরাম, আলেম-ওলামার সংখ্যা অসংখ্য ও অগণিত।

মানুষ যখন সংসারের মায়াময় বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে ভুলে যায় নিজের শ্রেষ্ঠত্বের কথা, ভুলে যায় আল্লাহকে এবং সত্যকে– তখন আল্লাহর পেয়ারা আলেম-ওলামাদের জীবনাদর্শই প্রজ্জ্বলিত করে তাদের সামনে হেদায়েতের আলো। সেই আলো সাধারণ মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের পথে টেনে নিয়ে যায়। সুতরাং ওলি-আল্লাহদের মহান জীবনালেখ্যই সত্যিকার ইসলামের বাস্তব দৃষ্টান্ত। আর তাঁদের জীবনাদর্শকেই গ্রহণ করতে হবে আমাদের পথের দিশারীরূপে। একমাত্র তাতেই পেতে পারি আমরা 'ছিরাতুল মুস্তাক্বীম' অর্থাৎ আল্লাহ-তা'য়ালার সরল ও সহজ পথ। তেমনি আমাদের মাঝে 'ছিরাতুল মুস্তাক্বীম'-এর পথ দেখিয়ে গেছেন অধ্যক্ষ হাফেয মোহাম্মদ আবদুল জলিল (রহঃ)।

অধ্যক্ষ হাফেয এম. এ. জলিল (রহঃ)-এর জন্ম চাঁদপুর জেলার মতলব থানার পাঠান বাজার আমিয়াপুর গ্রামে। দিল্লীর প্রখ্যাত বুযুর্গ ও ফেকাহবিদ আলেম এবং বাদশাহ আলমগীরের ওস্তাদ হযরত মোল্লা জিউন (রহঃ) ছিলেন তাঁর বংশের উর্দ্ধতন পুরুষ। তিনি পবিত্র কোরআন দু'বছর তিন মাসে হিফয শেষ করেন। ছাত্র জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। ছাত্র জীবন শেষ করে প্রথমে অধ্যাপনা এরপর ইমামতি– পরবর্তীতে খতীবের দায়িত্ব পালন করেন। ইমামতির– ফাঁকে ফাঁকে অগ্রণী ব্যাংকে প্রভেশনারী অফিসার হিসেবে কাজ করে এক বছরের মধ্যেই ইস্তফা দেন। ১৯৭৩ ইং সালে বিসিএস লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। হাজীগঞ্জ বড় মসজিদে ছয় মাস ইমাম ও খতিবের দায়িত্ব পালন করে ইস্তফা দিয়ে পুনরায় চট্টগ্রাম চলে যান। চট্টগ্রামের জামেয়া আহমদিয়া সুন্নীয়া আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ পদে ১৯৭৭ সালে যোগদান করেন। ১৯৭৮ সালে মোহাম্মদপুর কাদেরিয়া তৈয়বিয়া আলীয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ পদের দায়িত্ব নিয়ে স্থায়ীভাবে ঢাকায় চলে আসেন। ১৯৮৭ ইং সাল থেকে ১৯৯০ইং পর্যন্ত মধ্যখানে ৪ বছর ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর ইমাম ট্রেনিং প্রজেক্ট ও ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়ে পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পুনরায় ১৯৯০ ইং-এর ডিসেম্বরে মোহাম্মদপুর কাদেরিয়া তৈয়বিয়া আলীয়া মাদ্রাসায় অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি মসজিদের খতিব, ওয়াজ-নসিহত ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের নির্বাচিত মহাসচিবের দায়িত্ব পালন করেন। বুখারী শরীফসহ তাঁর লিখিত, অনুদিত ও সম্পাদিত ১৯ খানা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া ১৯৯৯ ইং সালে মাসিক পত্রিকা সুন্নীবার্তা আমাদেরকে উপহার দিয়ে গেছেন।

অধ্যক্ষ হাফেয এম.এ. জলিল (রহঃ)- এর জীবন ও কর্ম লেখার মত দুঃসাহস আমার নেই। যেহেতু তাঁর ওফাত দিবস সেপ্টেম্বর মাসে। সেই হিসেবে হযরতুল মাওলানা মুফতি মোহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দীন, খতীব এবং সুন্নীবার্তার সম্পাদক হিসেবে হুজুরের ওপর একটা লেখা লিখার জন্যে বলেছেন তাই চেষ্টা। অধ্যক্ষ হাফেয এম.এ. জলিল (রহঃ)-এর জীবনের ছোট বড় অনেক ঘটনা তাঁর নিজ মুখ থেকে শোনার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কারণ হুজুরের প্রকাশনার বেশীর ভাগই আমাদের এইচ কে প্রিন্টার্স থেকে মুদ্রণ করেছেন। সেই সুবাধে হুজুর মাঝে মাঝেই আমার অফিসে আসতেন।

অনেক সময় আমার অফিসে বসেই প্রুফ দেখতেন। ফাঁকে ফাঁকে কথোপকথন হত। এছাড়া আজমীর শরীফে ২১ দিনের সফরসঙ্গী ছিলাম আমি অধম। যে সফর শেষে "সফর নামায়ে আজমীর" পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয়।

মাসিক সুন্নীবার্তা প্রকাশনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় ১৯৯৯ ইং সালে। এর একটা প্রেক্ষাপট রয়েছে। মাওঃ দিল্লুর রহমান সাহেব আল-বায়েন্যাত নামে মাসিক একটি পত্রিকা প্রকাশ করলেন। প্রথম দিকে সুন্নীয়তের ওপর বেশ লেখা-লেখি করে সুন্নীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু পরবর্তীতে সুন্নীয়তের লেবেল এঁটে উল্টা-পাল্টা লেখা শুরু করেন। হুজুর খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন যে, কিভাবে তার সময়োচিত জবাব দেয়া যায়। তিনি আমাদের সাথে পরামর্শ করলেন এবং বললেন, তলোয়ার এর আঘাত তলোয়ার দিয়েই ফিরাতে হয়। পরামর্শকরা পরামর্শ দিলেন যে হুজুর আল-বায়্যেনানত-এর জবাব দিতে হলে আমাদেরকেও মাসিক পত্রিকা বের করতে হবে। তাহলেই উপযুক্ত জবাব দেয়া যাবে। তিনি সম্মতি জানালেন বটে– কিন্তু আর্থিক যোগান কিভাবে হবে তা নিয়ে চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়লেন। আমরা যারা হুজুরের কাছাকাছি ছিলাম সহযোগিতা করার আশ্বাস দিয়েছিলাম। সেই থেকে 'মাসিক সুন্নীবার্তা'র প্রকাশনা যাত্রা শুরু হলো। বেশীরভাগ লেখা এবং প্রুফ দেখাসহ সব কাজ হুজুর একাই করতেন। আস্তে আস্তে বিভিন্ন লেখকের লেখা ছাপাতে শুরু হলো। মাঝে মাঝে অনিয়মিত প্রকাশিত হতো। ২/৩ মাস একত্রে প্রকাশিত হতো। এভাবে চড়াই-ওতরাই-এর মধ্য দিয়ে হাটি হাঁটি পা-পা করে সুন্নীবার্তা চলতে লাগলো। এরই মধ্যে ২০০৮ ইং সাল থেকে অসুস্থ হয়ে পড়লেন হুজুর। অসুস্থতার মাঝেও সুন্নীবার্তার খোঁজ-খবর সবসময় রাখতেন। বর্তমান সম্পাদক সাহেবকে সুন্নীবার্তার পূর্ণ দায়িত্বভার কিভাবে দিয়েছেন তা আমরা হযরতুল আল্লামা মুফতী মোহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দিন সাহেব-এর কাছ থেকে শুনেছি। হুজুর-এর জীবদ্দশায়ও বর্তমান খতিব সাহেব প্রশ্নোত্তর বিভাগসহ লেখা-লেখির দায়িত্ব পালন করেছেন।

হুজুর যখন বেশ অসুস্থ তখন এক শুক্রবার এ্যাম্বুলেন্সে করে মসজিদে আসেন এবং সকল মুসল্লীদের উদ্দেশে বলেছিলেন, আমি আপনাদের মাঝে দু'টো জিনিস রেখে গেলাম একটি 'মাসিক সুন্নীবার্তা' আর অন্যটি 'মাওলানা মুফতি মোহাম্মদ বখতিয়ারকে গাউছুল আযম জামে মসজিদের খতিব' হিসেবে। যা আপনারা সবাই জানেন। এই দু'টো জিনিস ছাড়া আরও মহা-মূল্যবান সম্পদ তিনি আমাদেরকে দিয়ে গেছেন। খতিব হিসেবে বর্তমান সময়ের খ্যাতিমান আলেমদের মধ্যে একজন এবং দিন দিন যথেষ্ট প্রজ্ঞার পরিচয় দিচ্ছেন তিনি। তাঁর ওয়াজে আম-লোকদের পরিবর্তন হচ্ছে, রাসূল প্রেমে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে। আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের দূর-দর্শিতা যে কত সুদূর তারই প্রমাণ রেখে গেছেন অধ্যক্ষ হাফেয এম.এ জলিল (রহঃ)। তিনি তখনই বুঝতে পেরেছিলেন যে, হযরতুল আল্লামা মুফতি মোহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দিন সাহেবই গাউছুল আযম জামে মসজিদের মুসল্লীদের আকৃষ্ট করতে পারবেন, তাঁর ওয়াজ দ্বারা। তাই তিনি তাঁকে মনোনীত করেছিলেন।

শুধু তাই নয়, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বাংলাদেশ-এর মুখপত্র 'মাসিক সুন্নীবার্তা'র দায়িত্বও তাঁরই ওপর ন্যস্ত করে দিয়ে গেছেন হুজুর। যথেষ্ট ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও খতিব সাহেব দায়িত্ব এড়াতে পারছেন না। তিনি সুন্নীবার্তা যথাসময়ে প্রকাশনার প্রাণান্তকর চেষ্টা করেও অনেক সময় হয়ে উঠছে না। আমরা সবাই সর্বান্তকরণে সহযোগিতা করলে নিশ্চয়ই খতিব সাহেব হুজুর যথাসময়ে মানসম্পন্ন সুন্নীবার্তা উপহার দিতে পারবেন– আমার বিশ্বাস। অলি-আল্লাহগণ সাধারণ মানুষকে হেদায়েতের রাস্তা দেখিয়ে যান বেলায়েতের দ্বারা। হুজুরও আমাদের মাঝে সুন্নীবার্তাসহ বেশ কিছু আকায়েদের ধর্মীয় পুস্তক রেখে গেছেন। যা প্রতিটি ঘরে ঘরে থাকা দরকার এবং প্রতিদিনই হুজুরের কোন না কিতাব পড়া দরকার যার ফলে ঈমান মজবুত হবে। আর লেখার কলেবর বাড়িয়ে ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে চাইনা। অন্তরের অন্তস্থল থেকে হুজুরের রূহানী দোয়া কামনা করছি এবং ভুল-ত্রুটি ক্ষমা চাচ্ছি পাঠকদের নিকট। এবং আমরা যারা হুজুরের ভক্তবৃন্দ সবাই যেন হুজুরের আদর্শকে ধারণ করে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বাংলাদেশের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় লাভ করতে পারি এ কামনা করছি। আমিন!

www.sunnibarta.com

আ'লা হযরত সম্পর্কে ওলামায়ে ইসলাম ও মনীষীদের অভিমত

মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী

এক. শায়খ মুখতার বিন আতারেদ আল জাদী, মসজিদে হেরম।

আ'লা হযরত আহমদ রেযা খান বর্তমান যুগের অভিজ্ঞ গবেষক, ওলামাদের সম্রাট। তাঁর সকল কথাই সত্য, বরঞ্চ তা আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের অসংখ্য মুজিযাসমূহের একটি মুজিযা স্বরূপ। যা এককভাবে আল্লাহ পাক এ মহান ইমামের পবিত্র হস্তে প্রকাশিত করেছেন। তিনি আমাদের সরদার, গবেষক, ওলামাদের পুরোধা,আহলে সুন্নাতের পথিকৃৎ। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাঁর জীবনাদর্শ অনুসরণে ধন্য করুন। তাঁর প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীদের হেদায়ত করুন।

দুই. শায়খ আহমদ আবুল খায়র বিন আবদুল্লাহ মিরদাদ, খতীব মসজিদে হেরম

মাওলানা আহামদ রেযা খান তিনি তো হাকীকাতের গুপ্তভান্ডার, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংরক্ষিত সম্ভার, মা'রেফতের সূর্য। যার ব্যক্তিত্ব দিবালোকের ন্যায় সমুজ্জ্বল, জাহের-বাতেনের ধারক, সুক্ষ্ম তত্ত্ব উদ্ঘাটনে সক্ষম। যে ব্যক্তি এ মহান ব্যক্তিত্বের জ্ঞান প্রজ্ঞা ও পান্ডিত্য সম্পর্কে অবগত তার বলা উচিৎ 'তিনি পূর্বাপর প্রজন্মের জন্য অনেক কিছু রেখে গেছেন।' যদিও আমাদের আগমন শেষ যুগে কিন্তু তিনি এমন কিছু এনেছেন যা পূর্ববর্তীদের অনেক কিছু স্মরণ করিয়ে দেয়। মহান সত্তার কুদরতী কৃপায় তাঁর মহান ব্যক্তিত্বে জগতের সকল গুণাবলী ও সৌন্দর্য সমৃদ্ধ।

তিন . ড. আল্লামা ইকবাল

বিশিষ্ট ইসলামী দার্শনিক আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির সাবেক অধ্যাপক, লাহোর বায়তুল কুরআন প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ড. জাবেদ আহমদ আলী বলেন, 'একদিন আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক মাওলানা সৈয়্যদ সুলায়মান আশরাফ (ওফাত ১৩৫৮ হি. / ১৯৩৯ খ্রি.) আল্লামা ড. ইকবালকে এক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানান। আনুমানিক ১৯৩৩ সনের ঘটনা। আল্লামা ড. ইকবাল অনুষ্ঠানে উপস্থিত হলেন। আমিও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলাম। অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে আ'লা হযরত মাওলানা শাহ মুহাম্মদ আহমদ রেযা খান রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি সম্পর্কে আলোচনা শুরু হলো, তখনি আল্লামা ড. ইকবাল আ'লা হযরত সম্পর্কে এ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, 'ভারত বর্ষের শেষ যুগে আ'লা হযরত রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি-এর মতো প্রজ্ঞাবান অভিজ্ঞ মেধাসম্পন্ন ফকীহ (ইসলামী আইনজ্ঞ) জন্মগ্রহণ করেননি। তাঁর ফতোয়া অধ্যায়নে আমি এ অভিমত ব্যক্ত করলাম। তাঁর ফতোয়াই তার প্রতিভা, বুদ্ধিমত্তা, উৎকর্ষ স্বভাব, পূর্ণাঙ্গ প্রজ্ঞা, এবং ধর্মীয় বিষয়াদিতে জ্ঞান সমুদ্রের ন্যায়বান স্বাক্ষী। জ্ঞানের দিক দিয়ে মাওলানা আহমদ রেযা খান বেরলভী হলেন যুগের ইমাম আবু হানিফা। (মাক্বালাতে ইয়াউমে রেযা, ৩য় খন্ড লাহোর এপ্রিল ৭১; আ'লা হযরত আরবাবে ইলম ওয়া দানেস্কী নয়র মে, পৃষ্ঠা:৭৯)।

চার. আল্লামা হাফেজ ক্বারী সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্,শেতালু শরীফ, ছিরিকোট, পাকিস্তান।

বাতিলপন্থিদের ষড়যন্ত্রের উপকরণাদি, নবী-রাসূল-ছাহাবা ও অলীর শানে ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণ এবং ভ্রান্তআক্বীদা যখন ভয়াবহ ঘুর্ণিঝড়ের আকার ধারণ করছিল, তখন আ'লা হযরতের লিখনী নুহ আলাইহিস সালামের কিস্তি তুল্য উম্মতে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের রহমতের সমুদ্র থেকে পানি পান করিয়ে পরিতৃপ্ত করেছেন। আ'লা হযরতের কাব্য শ্রবণে ঈমানদার নবীপ্রেমে বিমোহিত হয়। লক্ষ্যণীয় যে, যে ব্যক্তিত্বের মুখ থেকে এ ধরণের হৃদয়গ্রাহী মর্মস্পর্শী কাব্য বের হতে পারে তাঁর অন্তরে কিরূপ অবস্থা বিরাজ করছে, নিশ্চয়ই তিনি ফানাফির রাসূলের মর্যাদায় অভিষিক্ত। (আ'লা হযরত আরবাবে ইলম ওয়া দানেস্কী নযর মে, পৃষ্ঠা:১২১)। পায়াগামাতে ইউমে রেযা লাহোর, পৃষ্ঠা: ৩১)

পাঁচ. ড.স্যার জিয়াউদ্দীন, সাবেক ভাইস চ্যান্সলর, আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি

নিজ দেশে আহমদ রেযার মত এতো বড় অভিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও ইউরোপ গিয়ে যা কিছু শিখেছি সময় অপচয় করেছি। (আ'লা হযরত আরবাবে ইলম ওয়া দানেস্কী নযর মে, পৃষ্ঠা:৮১)।

ছয়. মৌলভী আশরাফ আলী থানভী

আহমদ রেযা বেরলভী মরহুম মগফুর আমার কাছে যথেষ্ঠ সম্মানের পাত্র। তিনি আমাদেরকে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর শান গোস্তাখী বা বেয়াদবী প্রদর্শকারী মনে করেন, প্রকৃত পক্ষে প্রেমে বিভোর হয়ে তিনি একথা বলেন। (আশরাফুস সাওয়ানিহ, খন্ডঃ ১, পৃষ্ঠাঃ-১২৯)।

তিনি আরো বলেন, আমার যদি সুযোগ হতো মাওলানা আহমদ রেযা খান বেরলভীর পিছনে নামায পড়ে নিতাম। (উসউয়া-ই আকাবির,পৃষ্ঠাঃ ১৮, সাপ্তহিক পত্রিকা 'রোজানা লাহোর ১১ই ফেব্রু. ১৯৬২ খ্রি.)।

যখন আ'লা হযরত ইহধাম ত্যাগ করলেন, তখন কোন একজন মাওলানা আশরাফ আলী থানবী ছাহেবকে সংবাদ দিলে শুনামাত্রই তিনি আ'লা হযরতের জন্য মাগফেরাত কামনা করেন। জনৈক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করল, মাওলানা আহমদ রেযা খান তো আপনাকে কাফের মনে করতেন। অথচ আপনি তার মাগফিরাত কামনা করছেন? তিনি বলেন, আহামদ রেযা আমাকে এজন্যই কাফের মনে করতেন যেহেতু আমি তার দৃষ্টিতে গোস্তাখে রাসূল ছিলাম। তিনি একথা জানার পরও যদি কাফের না বলেন তিনি নিজে কাফের হয়ে যাবেন। (দৈনিক রাওয়াল পিন্ডি, ১লা নভেম্বর ১৯৮১ খ্রি.।)

সাত. আবুল আ'লা মওদুদী

জামাতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা আবুল আ'লা মওদুদী বলেন, মাওলানা আহমদ রেযা খান মরহুম মগফুর আমার দৃষ্টিতে একজন অসাধরণ জ্ঞানী ও দূরদর্শীতার অধিকারী ব্যক্তিত্ব। তিনি মুসলিম মিল্লাতের একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা যদিও তাঁর সাথে কতিপয় বিষয়ে আমার বিরোধ রয়েছে, তবুও আমি তাঁর প্রভুত দ্বীনি খেদমতকে স্বীকার করি। (আল মিযান, বোম্বাই, ১৯৭৬ খ্রি. পৃষ্ঠা :১৬ মকালাতে ইওমে রেযা, খন্ডঃ ২য়, পৃষ্ঠাঃ ৫৪০)

আট. আল্লামা আ'লা উদ্দীন সিদ্দিকী, চেয়ারম্যান ইসলামী মোশাওয়ারা কাউন্সিল, সাবেক ভাইস চ্যান্সলর করাচী ইউনিভার্সিটি

ইসলাম বিকৃতিকারীদের যাঁতাকালে দ্বীনের মর্যাদা যখন বিলুপ্ত হতে চলছিল, তখন মাওলানা আহমদ রেযা খান কাদেরী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি সম্মুখপানে অগ্রসর হলেন এবং দ্বীনের যথার্থ মর্যাদা সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছিলেন ইমাম আহলে সুন্নাত। এজন্যই মাওলানা বেরলভীর জীবনাদর্শকে মুসলমানদের আলোকবর্তিকা রূপে গ্রহণ করা উচিত। (মাক্বালাতে ইউমে রেযা, লাহোর, পৃষ্ঠা : ১৭)

নয়. ড. ইশতিয়াক হোসাইন কোরাইশি, সাবেক ভাইস চ্যান্সলর, করাচী ইউনিভার্সিটি।

দ্বীনি বিষয়াদিতে আ'লা হযরত আহমদ রেযা খান এর যে দক্ষতা ছিলো সমসাময়িক কালে তাঁর দৃষ্টান্ত ছিল বিরল। অন্যান্য বিষয়েও তার অসাধারণ পান্ডিত্য ছিল। তার অন্তর ছিল নবীপ্রেমের সুতিকাগার। যা আবেগ অনুভূতির গভীরতা ব্যতিরেকে সৃষ্টি হয় না। (খয়া'বানে রেযা লাহোর, পৃষ্ঠাঃ ৪৩)

দশ. ড. জমীল জালভী, ভাইস চ্যান্সেলর, করাচী ইউনিভার্সিটি।

চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ মাওলানা শাহ আহমদ রেযা খান বেরলভী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি ছিলেন উঁচুমানের ইসলামী আইনজ্ঞ, জ্ঞানসমুদ্র, আদর্শ কবি, শরীয়ত ও তরীক্বতের পাবন্দ, বুজুর্গ ব্যক্তিত্ব। (মা'আরেফে রেযা, পৃষ্ঠাঃ ৪৭)

এগার. শেখ ইমতিয়াজ আলী, ভাইস চ্যান্সেলর, পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি, লাহোর।

'হযরত মালোনা আহমদ রেযা খান বেরলভী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ আলেম, সর্বজনগ্রাহ্য আদর্শ কবি, জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় সহস্রাধিক পুস্তক প্রণেতা,ইসলামী ফিকহ ও হাদীস শাস্ত্রে তার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বড় প্রশস্ত ও গভীর। ইসলামি ফিকাহশাস্ত্রের জগতে তার শ্রেষ্ঠ অমর কীর্তি হচ্ছে 'ফতোয়ায়ে রিজভীয়্যাহ। (খা'য়াবানে রেযা, লাহোর, পৃষ্ঠা -৪৪)

বার. প্রফেসর কাররার হোসাইন, ভাইস চ্যান্সেলর, বেলুচিস্তান ইউনিভার্সিটি।

আমি মাওলানা আহমদ রেযা খান বেরলভীর ব্যক্তিত্বের প্রতি এ কারণেই প্রভাবিত হয়েছি যেহেতু তিনি ইলম ও আমল উভয় পর্যায়ে এশক্বে রাসূল বা নবী প্রেমকে প্রথম মর্যাদা দিয়েছেন, যা ব্যতীত দ্বীন একটি প্রাণহীন দেহতুল্য। (খায়া'বানে রেযা, লাহোর, পৃষ্ঠা- ৮৫)

তের. ড. নসীব আহমদ নাসের, ভাইস চ্যান্সলর, ইসলামি ইউনিভার্সিটি ভাওয়ালপুর।

হযরত মাওলানা আহমদ রেযা খান বেরলভীর মহান ব্যাক্তিত্ব এবং তার জ্ঞানগত শ্রেষ্ঠত্ব বহু উচুমানের। নিঃসন্দেহে তিনি জ্ঞানসমুদ্রে। (খায়া'বানে রেযা, লাহোর, পৃষ্ঠা- ১১৫)

চৌদ্দ. সৈয়্যাদ আওসাফ আলী,হামদর্দ ইউনিভার্সিটি, নিউ দিলী।

মাওলানা আহমদ রেযা খান বেরলভীর পরলোক গমন অন্ততঃ অর্ধশতাব্দী অতিক্রম করেছে। দুঃখজনক যে, এত স্বল্পসময়ে আমরা এমন একজন বিজ্ঞ আলেম ও অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্বকে ভুলতে বসেছি এর সবচেয়ে বড় কারণ তার আক্বীদার বিশুদ্ধতা ও দৃঢ়তা, যার সামনে কোন ভিন্ন মতাদর্শের প্রদীপ প্রজ্বলিত হয়নি। (আ মিযান, ইমাম রেযা সংখ্যা, বোম্বাই, পৃষ্ঠাঃ ২০)।

পনের. প্রফেসর আসগর ছাওদায়ী, প্রিন্সিপাল, ইকবাল কলেজ, শিয়ালকোট।

আ'লা হযরত রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি-এর মতো জ্ঞানী পন্ডিত সম্বন্ধে অভিমত ব্যক্ত করা মহা মনীষীদেরই কাজ। আমি তো কোন দিক দিয়েই নিজকে এ কাজের যোগ্য মনে করছি না। (পায়গামাতে রেযা, পৃষ্ঠা : ৪৩)

ষোল. ড.গোলাম সুস্তাফা খান (সিন্ধু ইউনিভার্সিটির উর্দূ বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান)

আ'লা হযরতের মাহাত্ম্য পূর্ণতা, তীক্ষ্ণতা, ও জ্ঞানের গভীরতার সামনে বড় বড় জ্ঞানী গুনী ইফনিভাসিটির অধ্যাপক ও গবেষকবৃন্দের অসহায় মনে হয়।

সতের. ড. হাযেম আলী খান, প্রফেসর আলীগড় মুসলিম ইউনিভর্সিটির,ভারত।

তিনি তার যুগের বিজ্ঞ প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্ব। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় পূর্ণমাত্রায় অভিজ্ঞ। আধুনিক জ্ঞানের প্রতিটি বিভাগে তার প্রচুর অবিজ্ঞতা ছিল।

আঠার. প্রফেসর গিয়াস কোরাইসি সাবেক শিক্ষক, যুক্তরাষ্ট্রের নিউকাসিল ইউনিভার্সিটি।

আ'লা হযরত তার গভীর প্রজ্ঞা ও প্রশস্ত জ্ঞানের আলোকে নিজস্ব সত্তাকে একটি ইসলামী ইউনিভার্সিটিতুল্য উন্নীত করতে সক্ষম হন।

উনিশ. প্রফেসর ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী, ডাইরেক্টর, এদারায়ে মিনহাজুল কুরআন, লাহোর।

আ'লা হযরত আ'লা হযরত খান রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি- এর ব্যক্তিত্বে এশাধারে বহু বিধ গুণের সমন্বয় ঘটেছে। তার ইলমে আকাঈদের খিদমত লক্ষ্য করলে তাকে একজন সার্থক মুজাদ্দিদ (সংস্কারক), ইলমে ফিকহশাস্ত্রের খিদমতের প্রেক্ষিতে একজন সফল মুজতাহিদ (গবেষক) এবং তাসাউফ ও তরীক্বতের খিদমত পর্যালোচনায় একজন যথার্থ মুছলিহ বা সংশোধক হিসেবে স্বীকৃত। (মাওলানা আহমদ রেযা কা ইলমী মকাম, লাহোর পৃষ্ঠাঃ ১৫, আ'লা হযরত আবরাবে ইলম ওয়া দানেস্কী নজর মে, পৃষ্ঠা : ১০০)

বিশ. ড. জহুর আহমদ আযহার, চেয়ারম্যান, আরবী বিভাগ, পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি লাহোর।,

'মাওলানা আহমদ রেযা খান বেরলভী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি এক বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ব্যক্তিত্ব এবং তার যুগের একজন বহুবিধ পূর্ণতায় সমৃদ্ধ মহান ব্যক্তিত্ব হিসেবে তাকে মূল্যায়ন করা যায়। (মাসিক হেযাজ জদীদ দিলী, নভেম্বর- ১৯৯১ খ্রি.)

একুশ. বিচারপতি কদীর উদ্দীন আহমত,সাবেক গভর্ণর, সিন্ধু প্রদেশ।

যে প্রকার প্রতিভা, উৎকৃষ্ট স্বভাব, প্রখর স্মৃতিশক্তি এবং জ্ঞানের গভীরতা আ'লা হযরতের মধ্যে ছিল তা কোন সাধারণ কথা নয় বরং তা এক দুর্লভ বস্তু। (আ'লা হযরত আরবাবে ইলম ওয়া দানেস্কী নযরমে,পৃষ্ঠা – ১০৩)

বাইশ. মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী, পরিচাল, নদওয়াতুল ওলামা লক্ষ্নৌ।

তার (মাওলানা আহমদ রেযা খান বেরলভী) রচনাবলীর মধ্যে 'ফতোয়ায়ে রিজভীয়্যাহ' ফিক্হ ও ফিক্হশাস্ত্রের খুঁটিনাটি বিষয়াদি স-প্রমাণ জানার জন্য এক নজীরবিহীন গ্রন্থ। তার কৃত 'কিফ্লুল ফকীহিল ফাহীম ফী ক্বিরতাসিদ দিরাহিম' (১৩২৩ হি.) মক্কা মুয়ায্যামায় অবস্থানকালে রচিত গ্রন্থটি তার অসাধারণ জ্ঞানের পরিচালক। (নুযহাতুল খাওয়াতির, খন্ডঃ ৮ম, পৃষ্ঠা-৩৯)

তেইশ. প্রফেসর মুখতার উদ্দীন আহমদ, ডীন, আর্টস ফ্যাকাল্টি মুসলিম ইউনিভার্সিটি, আলীগড়।

তার (মাওলানা আহমদ রেযা খান) সত্ত্বা 'আল হুব্বু ফিল্লাহ ওয়াল বুগজু ফিল্লাহ' এর জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। আল্লাহ ও রাসূল প্রেমিকদেরকে তিনি নিজের প্রিয়জন মনে করতেন। আর আল্লাহ ও রাসূলের শত্রুদেরকে নিজের শত্রু মনে করতেন। কারো প্রতি ব্যক্তিগত শত্রুতায় অভ্যস্থ নন। শত্রুর প্রতি কখনো কঠোর আচরণ করেননি। কিন্তু দ্বীনের শত্রুর প্রতি কখনো কোমলতা প্রদর্শন করেননি। আ'লা হযরতের জীবনের প্রতিটি দিক সুন্নাতে রাসূলের আলোকে আলোকিত। তিনি বহু বিলুপ্ত সুন্নাত পূনরুজ্জীবিত করেছেন। ('আল মিযান' আ'লা হযরত সংখ্যা, পৃষ্ঠাঃ ৩৩৫, বোম্বাই ১৯৭৭ খ্রি.)